রেশমী

পরেশ ভট্টাচার্য

যোগমায়া প্রকাশনী
৬০ পটুয়াটোলা লেন। কলি-৯

প্রকাশক : যোগমায়া প্রকাশনী । প্রযত্নে / শ্যামলী ঘোষ,
৬০ পটুয়াটোলা লেন । কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : ২৫ বৈশাখ । ১৩৫৯ । মে ১৯৫২ ।

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

মুদ্রাকর : সত্যরঞ্জন জানা
মাদার প্রিন্টার্স
৬৮এইচ/১৮/১ মাণিকতলা মেন রোড
কলকাতা—৭০০০৫৪

আমার স্নেহের
বোন শ্যামলীকে—

গুমটি মাঠের ঘুম ভাঙছে।

প্রতি ভোরের মতো আজও শোনা যায় নামগান—ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে। খোল-করতাল বাজিয়ে গাইছে শারু বৈরাগী। সপরিবারে।

রাতভোরে নামগানের কথা আর সুর ভালোই লাগে। শুধু কানে নয়, মর্মে গিয়ে পৌঁছয়।

মাঝখানে মাঠ, চারদিকে সারবন্দী টালি আর টিনে ছাওয়া ছোট ছোট ঘর। কতকটা ঝোপড়ির মতো। ঘরের দেয়াল হয় চাঁচ না হয় মুলি বাঁশের বাখারির। ইঁটের দেয়ালের ঘরও আছে কয়েকটা।

গুমটি মাঠের ঘুম ভাঙে নাম গানের সুরে। ছয় ঋতু, বারো মাস এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না।

বছর তিরিশেক আগে এখানে ছিল মার্টিন কোম্পানীর রেল-লাইনের ইঞ্জিন গুমটি। মার্টিন কোম্পানীর রেললাইন উঠে গেল, সেই সঙ্গে গুমটিও। পুরানো ইঞ্জিন, ভাঙাচোরা বগি আর লোহালক্কড় যা ছিল, কলকাতার কালোয়াররা নিয়ে গেল লরি বোঝাই করে।

গুমটির ফাঁকা মাঠ পড়ে রইলো।

টাউন বাজারের কাছাকাছি জায়গাটা ভালোই। প্রথম নজর পড়েছিল সাধন দত্তর। কথাটা সে তার মন-পছন্দ লোকদের বললে। তারপর একদিন রাতে একদল মানুষ বাঁশখুঁটি পুঁতে মাঠের দখল নিলে। আশপাশের কিছু লোক আপত্তি জানিয়েছিল। কিন্তু সে আপত্তি ধোপে টিকলো না। কার আপত্তি কে শোনে।

ঠিকানা ছিল না এমন একদল মানুষ স্থায়ী ঠিকানা পেল গুমটি মাঠে ঘর বেঁধে।

হরেক জীবিকার মানুষ এখানে। বাস লরির কণ্ডাকটর, ক্লিনার, ঠিকা মজুর, রিকশাওয়ালা থেকে আরম্ভ করে ফৌজদারি কোর্টের মুহুরি-ফড়েও এখানে আছে। এছাড়া রয়েছে রাস্তায় হাটে-বাজারে বসা জ্যোতিষী, তাবিচ মাদুলির কারবারি, সিনেমা-টিকিটের 'বেলাকার', চোলাই মদের কারবারি। মেয়েদের মধ্যে অনেকে কাছারি পাড়ায় বাবুদের বাড়ি মাস মাইনের এটা ওটা কাজও করে। আজকাল আবার নতুন এক কাজ হয়েছে, মেয়েরা সে কাজে বেশ দু-পয়সা কামাই করে। মাছের আড়তে গিয়ে বাগদা আর গলদা চিংড়ির মাথা ছাড়ানো। সাত-আট ঘণ্টা কাজ করলে দশ-বারো টাকা আঁচলে বেঁধে আনতে পারে। যাদের হাত চলে বেশি, তারা পনেরো-বিশ টাকা অব্দি পায়। কাজ ফুরোন পয়সা।

সরলরেখায় না হোক, গুমটি মাঠের মানুষের দিন সুখ-দুঃখের জোয়ার ভাঁটায় এক রকম চলে যায়। আর প্রতিটি দিন আরম্ভ হয় হারু বৈরাগীর নামগানের সুরে। হারুর শরীর বয়সের ভারে ভাঙলেও গলা ভাঙেনি। গলাটা তার এখনো চাঁচাছোলা।

রেশমী উঠে বসলো। ঘুম চোখে দেখলো দরজা খোলা। মা ঘরে নেই। আবার পাশ-বালিশটা বুকে জড়িয়ে শুয়ে পড়লো রেশমী। নামগানের সুরটা বেশ লাগছে।

নামগান শেষ হতেই উঠে পড়লো রেশমী। মাথার দিকটার জানলাটা খুলে দিলে। এখনো রোদ ওঠেনি। সবে পূব আকাশ লাল হয়েছে।

বাইরে এলো রেশমী। দেখলো, মা নিম্বেশ্বরতলা ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করছে। গুমটি মাঠের ঠাকুর নিম্বেশ্বর।

একটা ঝাঁকড়া নিমগাছ। গোড়ায় বাঁধানো বেদী। বেদীর

ওপর দুটো কালো পাথরের গোলাকার নুড়ি। আকারে বেশ বড়। এই পাথর দুটিকে ফুল, জল, চন্দন, বেলপাতা দিয়ে পূজো করে গুমটি মাঠের মানুষ।

যখন জবর দখল শুরু হয়, তখন নিমের চারাটা আগাছার জঙ্গলের মধ্যেই ছিল। আগাছা সাফসোফ করলো, কিন্তু নিমের চারাটাকে বাঁচিয়ে রাখলো। ফাঁকা জায়গায় চারাটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো।

টাউন বাজার এলাকায় দোকানে দোকানে গণেশ পূজো করে বেড়াতো নগেন ঠাকুর। একদিন কোত্থেকে দুটি গোলাকার নুড়ি পাথর এনে রাখলো নিমগাছের গোড়ায়। তারপর দেখা গেল প্রতিদিন পূজো করে ফেরার সময় একটা কি দুটো থান ইঁট বয়ে নিয়ে আসছে নগেন।

সাধন দত্ত একদিন জিজ্ঞেস করে, ঠাকুর, তুমি রোজ ইঁট আনো কেন?

নগেন বলে, নিমগাছের গোড়াটা বাঁধাবো।

সাধন দত্ত হাসে। বলে, তুমি দেখছি খ্যাপা মানুষ। আর ইঁট বয়ে এনো না। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

সাধন দত্তই ব্যবস্থা করে দিলে। গুমটি মাঠের বাসিন্দাদের কাছ থেকে কিছু কিছু টাকা চাইলো সে। শ সাতেক টাকা উঠলো। সেই টাকায় নিমগাছের গোড়া বাঁধানো হলো ইঁট সিমেন্ট দিয়ে। তারপর নগেন ঠাকুরের ইচ্ছেয় রাজমিস্ত্রী সিমেন্টের গায়ে লিখে দিলে ওঁ নিম্বেশ্বর।

নগেন ঠাকুর নেই। বছর পাঁচেক হলো মারা গেছে। কিন্তু নিম্বেশ্বর আছে। গুমটি মাঠের মানুষের বিশ্বাস নিম্বেশ্বর জাগ্রত দেবতা।

রেশমীর মা লীলা রোজই ভোরে উঠে নিম্বেশ্বরের বেদীর চারপাশ ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করে। বেদীর ওপরটা জল-ন্যাকড়া দিয়ে মুছে দেয়।

গুমটি মাঠের দিন শুরু হয়েছে। এখন যে যার কাজের ধান্দায় বেরিয়ে পড়ছে।

রেশমী চোখে মুখে জল দিতে গিয়ে দেখলো, ওর বাবা দাশু সামন্ত আসছে টলতে টলতে। রাতের ডিউটি ছিল বরফকলে, হপ্তার টাকা পেয়ে নেশা করে ফিরছে।

নেশা করলেই দাশুর মাথাটা বিগড়ে যায়। ভালো কথা তখন তার মুখে আসে না। কারণে অকারণে খিস্তি আওড়াবে, নোংরা কথায় বৌ-মেয়েকে গালমন্দ করবে, আর ঘরে ঢুকে এটা ওটা ভাঙচুর করবে। নেশা করলে মানুষটার মাথায় যেন দুষ্টু ভূত ভর করে।

বাবাকে দেখেই রেশমী আড়ালে সরে যেতে চায়। কিন্তু যেতে পারে না। দাশু ওকে দেখেই চিৎকার করে ওঠে, এই নবাবের বেটি, যাচ্ছিস কোথায়? দাঁড়া।

রেশমী দাঁড়ায়। দাশু এগিয়ে আসে। বারান্দার খুঁটি ধরে মেয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বার কয়েক হেঁচকি তোলে। তারপর পকেট থেকে কতকগুলো নোট বার করে বলে, নে, রেখে দে।

টাকাগুলো হাত পেতে নেয় রেশমী। দাশু খোঁচা দিয়ে বলে, বাবাকে দেখে ঘেন্নায় সরে যাচ্ছিলি, কিন্তু টাকার জন্যে বেশ তো হাত বাড়ালি। টাকায় ঘেন্না নেই, না?

রেশমী কথার পিঠে কথা বলে না। এবারে দাশু লক্ষ্য করে লীলাকে। লীলা জল ছড়া দিচ্ছে বাঁধানো বেদীতে। এলোমেলো পা ফেলে দাশু এগিয়ে যায়। দাঁড়ায় বেদীর কাছে গিয়ে। লীলা যেন দেখেও দেখেনি। নিজের খেয়ালে ন্যাতা দিয়ে বেদী মুছতে আরম্ভ করে।

—হুঁ, বাবা নিম্বেশ্বর। দাশু বিশ্রী মুখভঙ্গি করে বলে, এ্যাই মাগী, রাত জেগে তোর স্বামী দেবতা বাড়ি ফিরলো আর তুই কিনা বাবা নিম্বেশ্বরের খিদমত খাটছিস। তোর নিম্বেশ্বরের নিকুচি করেছে। রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা পাথর, তাই আবার ঠাকুরের···

কথা শেষ করেনা দাশু।

লীলার সর্বাঙ্গ রি রি করে ওঠে। কটমটিয়ে তাকায় স্বামীর দিকে। রেশমীরও কানে গেছে বাবার কথা। সে-ও লজ্জায় সিঁটিয়ে যায়।

বটুক হালদার মগ হাতে যাচ্ছিল, কথাটা সে-ও শুনেছে। এগিয়ে আসে মারমুখো হয়ে। বলে, তোমার জিব টেনে ছিঁড়ে দেবো দাশুদা।

—কি! দাশুর তখন বেসামাল অবস্থা। খিস্তি আউড়ে বলে ওঠে, যা যা তোর জোড়া বাপকে ডেকে নিয়ে আয়।

বটুক বদরাগী মানুষ। সজোরে চড় মারে দাশুর গালে। টাল সামলাতে না পেরে দাশু পড়ে যায় বেদীর ওপর। এদিক ওদিক থেকে এ-ও ছুটে আসে। বটুক তখনো ফুঁসছে, আর দাশুর মুখে খিস্তির খই ফুটছে। দেখে শুনে রেশমী ঘরে যায়। লীলা লজ্জায় ঘেন্নায় বেদীর কোণে মাথা নিচু করে বসে থাকে।

বটুককে টেনে নিয়ে যায় কয়েকজন। দাশুকে পাঁজাকোলা করে তুলে তার ঘরের বারান্দায় বসিয়ে দিয়ে আসে কজন মিলে।

সাইকেল নিয়ে বেরোচ্ছিল মস্তান পল্টন, সে-ও এসে দাঁড়ায়। পল্টন আসার সঙ্গে সঙ্গে সবাই চুপ করে যায়। মস্তানো কা মস্তান পল্টনকে সবাই যমের মতো ভয় করে।

সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে রেখে পল্টন দু হাত কোমরে দিয়ে দাঁড়ায়। বলে, কি র‍্যা! কী হয়েছে র‍্যা?

ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানুষেরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে। পল্টন একবার চোখটা ঘুরিয়ে নেয় চারদিকে। বলে, যাঃ শালা সব বোবা মেরে গেল!

বারান্দা থেকে দাশু বলে ওঠে, জানিস পল্টন, বটুক বলে কিনা আমার জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলবে? খামোকা আমাকে চড় মারলো।

পল্টন এবারে এগিয়ে যায় দাশুর দিকে। সবাই জানে দাশু

সামন্তকে নেকনজরে দেখে পল্টন। কারণ আর কিছু না, রেশমী। রেশমীর ওপর নজরটান আছে পল্টনের। থাকলে কি হবে, এখনো পর্যন্ত মেয়েটাকে বাগে আনতে পারেনি সে।

দাশুর কোলে ঝোল টানার মওকা পেয়ে পল্টন মনে মনে খুশিই হয়। পল্টন সামনে আসতে দাশু বলে, বটুক হারামজাদা খামোকা আমায় মারলো। সবাই দাঁড়িয়ে দেখলো, কেউ কিছু বললে না! আর আমারে চ্যাংদোলা করে শুইয়ে দিয়ে গেল এখানে!

—রেশমী কোথায়? পল্টন বলে, তোমারে যখন মারে সে কোথায় ছিল?

—তাকেই জিগেস কর না।

ডাকতে হয় না, রেশমী নিজে থেকেই দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। সত্যি কথা বলতে বাধে না রেশমীর। সব কথা বলতে না পারলেও, সে যেটুকু বলে তাতে তার বাবারই দোষ দেখায়। পল্টন ফ্যাসাদে পড়ে। সে এখন কাকে খুশি করবে।

দাশু এখন করাতের নিচে। কি বলবে ভেবে পায় না। শেষটা নিজের বুক চাপড়ে বলে ওঠে, ও যদি আমার মেয়ে হতো তাহলে এ কথা বলতে পারতো না।

রেশমী যেন শূন্য থেকে আছড়ে পড়েছে। চমক ভাঙতেই কোমরে শাড়ির আঁচল জড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। বাবার মুখের ওপর পাল্টা কথা ছুঁড়ে মারে। বলে, তোমার মেয়ে নই, তবে আমি কার মেয়ে?

দাশু ফ্যাচ ফ্যাচ করে বিদঘুটে হাসি হাসে। বলে, তোর ওই কটাশে চোখ, রেশমের মতন চুল, কাঁচা হলুদের মতন গায়ের রঙ, অমন আগুন জ্বালানো রূপ—আমাকে কেন, তোর মাকে জিগেস করগে—সেই ভালো বলতে পারবে।

রেশমী চুপ হয়ে যায়। অনেক চোখ চেয়ে আছে, অনেক কান খাড়া হয়ে আছে—সে জানে এখন কথা বাড়ানো মানে কেচ্ছা-

কেলেঙ্কারীর একশেষ। নীরবে মাথা নিচু করে চলে যায় ঘরে।

দাশু তখন বারান্দায় টান টান হয়ে শুয়ে পড়েছে। যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারাও এক এক করে চলে যায়। একবার রেশমীর ঘরের দিকে চোখ ফেলে শিস দিতে দিতে সাইকেল ছুটিয়ে চলে যায় পল্টন। ঝড় যখন উঠেছে, তখন পাকা ফল টুপ করে পড়ে যাবে। পড়লেই একেবারে হাতের মুঠোয়।

গুমটি হাতের চৌহদ্দি ছেড়ে পল্টন দ্রুত সাইকেল ছুটিয়ে চলেছে টাউন বাজারের দিকে।

গুমটি মাঠের পিছনেই পুকুর। পুকুর থেকে ডুব দিয়ে ভিজে কাপড়ে ঘরে এলো লীলা। দু চোখে তার কান্নার রঙ। আসার সময় ঘোমটায় মুখ ঢেকে এসেছে, পাছে কারো সঙ্গে চোখাচোখি হয়। এমনিতেই মাতাল মানুষটার জন্যে লজ্জার শেষ নেই, তার ওপর আজ যা হয়েছে তাতে লজ্জার আগুনে মুখটা পুড়ে গেছে। শুধু লজ্জা নয়, একটা জ্বালাও মনের মধ্যে। সে জ্বালার কথা মুখ ফুটে বলার নয়।

দু হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসেছিল রেশমী, মা ঘরে ঢুকতে শুধু একবার মুখ তুললো এই পর্যন্ত। মা-ও কোনো কথা বললে না।

ভিজে কাপড় ছাড়লো লীলা। ভিজে চুল গামছায় পাকিয়ে ঘরের মধ্যেই নিংড়ে নিলে। তারপর আরশি নিয়ে বসলো চুলের সিঁথিটা ঠিক করে নিতে। চিরুনির ডগা দিয়ে সিঁদুরও পরলো।

একবার আড়চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে ঘরের বাইরে এলো রেশমী। দাশু এখন চিৎ হয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। কটা মাছি উড়ছে আর বসছে দাশুর মুখের ওপর। কিন্তু দাশুর হুঁশ নেই।

ঘুমন্ত মানুষটার মুখের দিকে তাকালো রেশমী। এখন মুখটা অন্যরকম। ভালো মানুষের মুখ। কে বলবে, একটু আগে ওই মুখে ছিল আস্তাকুঁড়ের নোংরা।

রোজ সকালে মাঠে খানিক পায়চারি করে রেশমী। কিন্তু আজ

বারান্দা থেকে নামতেও পারলো না। আশপাশের বাড়ির অনেক কৌতূহলী চোখ তার দিকে। রেশমীর কেমন অস্বস্তি হচ্ছে বারান্দায় দাঁড়াতে।

আবার ঘরে ঢুকলো রেশমী। মেয়ের মুখোমুখি থাকতে মায়েরও লজ্জা। মেয়ে ঘরে আসতেই মা পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল।

অন্যদিন তোলা উনুন বাইরে বার করে আঁচ দেয় লীলা। আজ রান্না ঘরের মধ্যেই অাঁচ ধবালো।

আরশিটা তক্তাপোশের ওপরে ফেলে রেখে গেছে মা। আরশিটা তুলে নিলে রেশমী। মুখের সামনে ধরলো। একেবারে মুখের কাছে আরশিটা ধরলে মুখটা অস্পষ্ট হয়ে যায়। আরশিটা বালিশের গায়ে তেরচা ভাবে দাঁড় করালো। রেশমীর মুখটা এখন ভাসছে আরশির কাঁচে। নিজের মুখটা নতুন করে দেখছে বেশমী। বেশম-রেশম চুল পাখির পালকের মতো নরম, দুচোখের তারা ঈষৎ কটা, মুখের রঙ কাঁচা হলুদের মতো। ফ্যাকফেকে ফর্সা নয়, একটু লালচে আভা জড়ানো। নিজের চোখে নিজেকে অচেনা লাগছে রেশমীর।

এই মুহূর্তে বাবলুকে মনে পডলো রেশমীব। বাবলু থাকলে খুব ভালো হতো। যার কাছে গেলে সে সব কিছু ভুলে যায়।

কিন্তু বাবলু থাকলে সে-ও-তো শুনতো তার বাবার কথা। শুনলে সেও হয়তো রেশমীর কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চাইতো। তবু মনকে বোঝালো রেশমী, বাবলুর মনটা অনেক ছড়ানো। সে একথা হেসে উড়িয়ে দিতো, গায়ে মাখতো না।

—চা খাবি তো খুকি? দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মা।

—দাও।

—ও মানুষটাকে ডাক।

—আমি পারবো না, তুমিই ডাকো।

লীলা একটু সময় চুপ থাকে। তারপর মেয়ের কাছে এসে

দাঁড়ায়। আলতোভাবে হাত রাখে মেয়ের পিঠে। বলে, ও মানুষটার ওপর রাগ করিস নে। জানিস তো ছাইপাঁশ গিললে ওর মাথার ঠিক থাকে না। আজ তো নতুন নয়, তুই জ্ঞান হওয়া এস্তক দেখছিস। ওর কথা মনে রাখিস নে।

—কিন্তু মা! রেশমী আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলো না। মাকে জড়িয়ে ধরে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লো।

লীলার দু চোখও জলে ভরে যায়। মেয়েকে নিবিড়ভাবে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে, ওর কথা তুই ভুলে যা খুকি।

—চেষ্টা করবো ভুলতে। রেশমী বলে, কিন্তু ভোলা যায় না। তুমিও পারবে না, আমি পারবো না।

একটু বেলা হতেই খোঁয়াড়ি ভাঙলো দাশুর। দু চোখ রগড়ে উঠে বসলো। বারকতক হাই তুলে আড়ামোড়া ভাঙলো। তারপর ডেকে উঠলো রেশমীর নাম ধরে। দাশু এখন অন্য মানুষ।

রেশমী নয়, লীলা এলো।

দাশু জিজ্ঞাসা করে, রেশমী কোথায়?

—ঘরে।

—কি করছে?

—বসে আছে।

দাশু অসহায় ভঙ্গিতে তাকালো লীলার মুখের দিকে। মেয়ের রাগ হয়েছে বুঝি?

কথার জবাব দিলে না লীলা। নেই বলেই।

—একটু চা দেবে? বারান্দায় খুঁটি ঠেস দিয়ে বসলো দাশু। বললে, শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছে।

—শরীরের আর দোষ কি। লীলা বললে, মুখ ধুয়ে নাও, চা দিচ্ছি।

রান্নাঘরে গিয়ে খানিকটা কেঁদে নিলে লীলা! চোখের জলে

দুঃখটা খানিক ধুয়ে গেল।

বাইরে থেকে আবার দাশুর গলা, কই গো চা দিলে না? তাড়াতাড়ি দাও, চা খেয়ে একবার বাজার যাবো।

চা খেয়ে ঘরে এলো দাশু। রেশমী তখন আরশির কাঁচে চোখ রেখে বসে আছে। দাশু এগিয়ে এসে মেয়ের পিঠে হাত রাখলো। বললে, কটা টাকা দে তো, বাজার থেকে ঘুরে আসি।

রেশমী টাকা বার করে দিলে। টাকা পকেটে নিয়ে দাশু বাজারের থলি হাতে বেরিয়ে পড়লো।

রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে লীলা। ভাবছে, নেশা করলে মানুষটা কত বদলে যায়। এতদিন যা করেছে, সবই সহ্য করেছে। কিন্তু এতদিনের সহনশীল মনটাকে আজ দুমড়ে মুষড়ে ভেঙে দিয়েছে মানুষটা। শুধু মেয়ে নয়, গুমটি মাঠের মানুষের কাছে তাকে আজ কত ছোট করে দিয়েছে।

ঘর থেকে বারান্দায় এলো রেশমী। টিয়ার খাঁচাটা ঘরে ছিল, বাইরের তারে টাঙিয়ে দিলে।

মেয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হতে মা চোখ ফিরিয়ে নিলে।

নিম্বেশ্বরতলায় পূজো দিতে এসেছে পল্টনের সোনামাসি। আধবুড়ি মেয়েমানুষ তবু সাজের ঘটা কি। নিজের ঘর-সংসার ছেড়ে বড় বোনের সংসারে। বাতে পঙ্গু পল্টনের মা। উঠে বসতেও পারে না নিজের শক্তিতে। সে তো দিনরাত গাল পাড়ছে ছোট বোনকে। কিন্তু সে কথায় কান দেয় না সোনা। সে আছে পল্টনের বাবা ভজহরির পোষা শালী হয়ে। পঙ্গু বৌ-এর কথা গায়ে মাখে না পল্টনের বাবা। তবে পল্টন মাঝে মাঝে ক্ষেপে যায়। দু-এক সময় দু-চার কথা শুনিয়েও দেয়। কিন্তু সোনামাসির সামনে পল্টন একেবারে ঢোঁড়া সাপ। দাপট আছে পল্টনের মাসির।

গুমটি মাঠের মানুষও ডাকসাইটে সোনামাসিকে সমীহ করে।

ভালবেসে নয়, ভয়ে। এক রেশমী ছাড়া সোনার মুখের ওপর কথা বলার সাহস কারো নেই।

নিম্বেশ্বরের মাথায় ফুল জল দিয়ে খানকয়েক বাতাসা ছড়িয়ে দেয় সোনা। কটা উদোম ছেলে ঘুরঘুর করছিল, বাতাসা কুড়োতে তারা ছুটে আসে।

ঠোঙার বাকি বাতাসা নিম্বেশ্বরের মাথায় ঠেকিয়ে হেলতে দুলতে রেশমীর কাছে আসে সোনামাসি।

নিজের দেমাক নিয়ে থাকে সোনামাসি। নিজে থেকে তেমন কারো সঙ্গে মাখামাখি করে না। তবে রেশমীর ওপর একটা ওপর-টান আছে তার।

রেশমীর হাতে কটা বাতাসা গুঁজে দেয় সোনামাসি। বলে, মনটারে একটু হালকা করার চেষ্টা কর।

রেশমী কোনো কথা বলে না। দুটো বাতাসা মুখে পুরে কড়মড়িয়ে চিবোতে আরম্ভ করে। সোনামাসি একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ফিসফিসিয়ে বলে, দিনকতক কোথাও ঘুরে আয় তোর মা'কে নিয়ে। কেন বলছি জানিস, এখানকার মানুষ সব ভালো না। তবে আমার পল্টন যদি তোর দিকে থাকে, তাহলে কেউ কিছু বলতে পারবে না। পারিস তো দুপুরে আসিস খন, আমার কাছে।

রেশমী তবুও কোনো কথা বলে না। সোনামাসির ফুসমন্তরও শেষ হয়েছে। হেলতে দুলতে থলথলে শরীরটা নিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে যায়।

হাতের বাতাসাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেয় রেশমী। মনে মনে বলে, হুঁ গায়ে বাতাস দিতে এয়েচে।

দাশু বাজার থেকে ফিরলো। থলে ভর্তি বাজার। নানা রকম তরকারি, সঙ্গে গোটা একটা রুই মাছ।

—অনেক দিন ভালো করে খাইনি খুকি। দাশু বাজারের থলি আর দড়িতে ঝোলানো মাছটা নামিয়ে রাখে। বলে, তোর

মারে ডাক, আর শোন বেশ কড়া করে এক কাপ চা বানা।

রেশমী যেমন বসেছিল, তেমনি বসে রইলো। দাশুও আর মেয়েকে ঘাঁটালো না। মেয়ের স্বভাব সে জানে। এখনি যা নয় তাই বলে বসবে। তাছাড়া আজ ওর মনমেজাজ বিগড়ে আছে। মেয়ের সামনে দাঁড়ালো না দাশু। ঘরে চলে গেল একবার মেয়ের দিকে তাকিয়ে।

লীলা বেরিয়ে এসে বাজারের থলি আর মাছটা রান্নাঘরে নিয়ে যায়।

কি মনে হলো রেশমীর, আস্তে আস্তে উঠে খিড়কির দিকে গেল। কাছেই পুকুর। পুকুরের চারধারে তালগাছ।

রেশমী চলে এলো পুকুরপাড়ে। নির্জন কোণ খুঁজে বসে রইলো চুপচাপ। সোনামাসির কথা মনে হলো। গুমটি মাঠের চৌহদ্দি ছেড়ে চলে যাওয়াই ভালো। কিন্তু মাকে সঙ্গে নিয়ে নয়, যদি যেতেই হয় একাই চলে যাবে সে। এমন কোথাও যাবে যেখানে চেনা মুখ নেই।

কিন্তু পরক্ষণে তার মনে হলো, কেন চলে যাবে সে। সে তো কোনো অন্যায় করেনি। যে নিয়মে মানুষ জন্মায়, সে তো সেই নিয়মেই জন্মেছে।

যা কিছু ভাবুক রেশমী, ওর বাবার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছে না। আর সত্যিই তো, এমন চোখ-ঝলসানো রূপ সে কোথায় পেল!

সারা দুপুর নাক ডাকিয়ে ঘুমোলো দাশু। আজও তার রাতের ডিউটি। বিকালের দিকে দাশু বেরিয়ে গেল। বাড়ি থাকলে যেমন যায়।

সন্ধ্যের পর ফিরে এলো দাশু। রেশমীর জন্যে একটা ছাপা শাড়ি নিয়ে। কয়েক দিন আগে বাবার কাছে একটা শাড়ি চেয়েছিল রেশমী। তখন দিতে পারেনি টাকার টানাটানির জন্যে।

শাড়িটা রেশমীর হাতে দিতে গেল দাশু। কিন্তু রেশমী হাত পেতে নিলে না। মানুষটাকে বাবা বলে ভাবতেও পারছে না সে।

শাড়িটা তক্তাপোশের ওপর রেখে দাশু বললে, আমার ইচ্ছে তুই শাড়িটা এখন পর। দেখি, এ শাড়িটা পরলে তোকে কেমন দেখায়।

রেশমী তাকালো বাবার মুখের দিকে। বাবার মুখে এ ধরনের কথা আজই সে প্রথম শুনলো। বললে, আজ থাক, কাল পরবো।

—তাই পরিস।

এরপর মেয়ের সঙ্গে আর কথা বললে না দাশু। বলার সময়ও নেই। রাত ডিউটিতে যাবার সময় হয়ে এসেছে।

রুটি তরকারি খেয়ে বেরিয়ে পড়লো দাশু। লীলা দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে দাঁড়ালো। মানুষটা আস্তে আস্তে হেঁটে যাচ্ছে। একটু এগিয়ে পিছন ফিরলো। একবার লীলার দিকে তাকালো। অন্যদিন রেশমীও দাঁড়ায়, আজও হয়তো রেশমীর মুখটা দেখতে চেয়েছিল দাশু।

মানুষটা অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে। স্বাভাবিক ভাবেই দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো লীলার।

রেশমী উপুড় হয়ে শুয়ে আছে তক্তাপোশের ওপর। পা দুটি ভাঁজ করে রেখেছে পাছার ওপর। লীলা আলতোভাবে হাত রাখলো মেয়ের পিঠে।

রেশমী জেগে আছে। কিন্তু মায়ের দিকে তাকাবার মতো মন তার নেই।

লীলা বললে, কিরে, তোর শরীর খারাপ হয়নি তো?

রেশমী উত্তর দিলে না। সে জানে, কথা বলতে হয় তাই বলছে মা। নিছক কথার কথা।

—খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়। লীলা বললে, শেষটা ঘুমিয়ে পড়বি। ঘুম থেকে উঠে তুই তো খেতে চাস নে।

রেশমী তবু সাড়া দিলে না। শুধু ভাঁজ করা পা দুটি ছড়িয়ে

দিলে। লীলা আবার বারান্দায় এসে বসলো আধ-বোনা আসনটা নিয়ে। আসন-বোনা যেমন তেমন, চুপচাপ বসে রইলো একরাশ ভাবনা নিয়ে।

গুমটি মাঠে এখন রাত নামছে।

॥ দুই ॥

খবরটা এলো সকালেই। সূর্য ওঠার আগে।

দাশু সামন্ত বারাসাতগামী ফাস্ট´ ট্রেনে কাটা পড়েছে। ধড় আর মুণ্ডু দু-টুকরো পড়ে আছে রেললাইনের ওপর।

রিকশাওয়ালা ছোটলাল গুমটি মাঠের একজন। কাক-ভোরে যাত্রী নিয়ে গিয়েছিল স্টেশনে। খবরটা শোনে সেখানেই। শুনে দেখতে গিয়েছিল। সে-ই চিনতে পারে দাশুকে। তারপরই রিকশা নিয়ে ছুটে এসেছে।

মা-মেয়ে দুজনেই ঘুমোচ্ছিল। কড়া নাড়ার আওয়াজে রেশমী দরজা খুলে দেয়। ভেবেছিল, বাবা। কিন্তু বাবা নয়, খবর।

খবরটা মা-মেয়ে শুনলো। কিন্তু কেউই ডুকরে কেঁদে উঠলো না। শুধু লীলাব চোখ ভিজে উঠলো।

রেশমী একটু চুপ করে থেকে জিগেস করলো, তুমি ঠিক চিনতে পেরেছো তো ছোটলাল?

ছোটলাল বললে, চেনা মানুষ, চিনতে পারবো না!

রেশমী ক্ষণমাত্র ভাবলো। তারপর বললে, তুমি একটু দাঁড়াও ছোটলাল, আমি যাবো তোমার রিকশায়।

ঘরে গেল রেশমী। বাবার দেয়া নতুন শাড়িটা পরলো। তরপর মাথার অগোছালো চুল আঙুল দিয়ে শাসন করে বেরিয়ে এলো।

—মাসিমা যাবে না? ছোটলাল জিগেস করলে।

—না। রেশমী বললে, আমি একাই যাবো।

নিম্বেশ্বরতলায় রিকশা দাঁড় করানো ছিল। রেশমী রিকশায়

চেপে বসলো। একবার পিছন ফিরে তাকালো রেশমী। মা দরজা সেঁটে দাঁড়িয়ে আছে।

হারু বৈরাগীর ঘরে খোল-করতাল বেজে উঠলো। নাম-গান আরম্ভ হবে এখনি।

বসিরহাট স্টেশনের আগে দাশু সামন্তর দু-টুকরো দেহটা পড়ে আছে। রেলের চাকা চলে গেছে গলার ওপর দিয়ে। পাশেই পড়ে আছে শূন্য মদের বোতল। বোতলটা ভাঙেনি।

রিকশাটা একটু দূরেই দাঁড় করিয়েছে ছোটলাল। পায়ে পায়ে হেঁটে এলো রেশমী। এখানে এখন অনেক মানুষের ভিড়। ভিড় ঠেলে রেশমী এলো বাবার দু-টুকরো দেহটার কাছে। বাবার মুখটা কী ভয়ংকর দেখাচ্ছে এখন। রেশমী শিউরে উঠলো। দু-হাতে চোখ চাপা দিলে। কান্না দূরে যাক, মুখে একটু শব্দও নেই।

অনেক চোখ এখন লাশ ছেড়ে রেশমীর ওপর। রেশমী বসে রয়েছে দু হাতে চোখ চেপে। বাবার ভয়ংকর মুখের দিকে তাকাতে পারছে না সে

—রেশমী।

ফিরে তাকালো রেশমী। পিছনে দাঁড়িয়ে বরফকলের মদন মাইতি আর দেবু। মদন মাইতিকে কাকা বলে ডাকে রেশমী। মানুষটি ভালো। দেবুকে দেখেছে, কিন্তু নিছক দেখা। বেহুঁশ মাতাল বাবাকে বার দুয়েক বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল দেবু।

রেশমীকে ডেকে নিয়ে একটু তফাতে এলো মদন। সঙ্গে দেবুও। রেশমীর চোখে এতটুকু জল নেই। শুধু থমথম করছে মুখখানা।

—তুই বাড়ি যা রেশমী।

রেশমী কোন কথা বললে না, একবার মদনকাকার দিকে তাকালো।

—খবরটা শুনেই ছুটে এইচি দেবুকে নিয়ে। দেবু তোর বাবার

'অনডারে' কাজ করে।

—আচ্ছা মদনকাকা, বাবা কেন মরলো বলতে পারো? রেশমী জানতে চাইলে, তোমাদের কাছে কিছু বলেনি?

—কি জানি, রাতে তো একসঙ্গে কাজ করছিলাম। রাত তিনটে নাগাদ বললে, মদনা, আমি যাচ্ছি, শরীরটা তেমন ভালো নেই। বললাম, এখন যাবে কি করে, তার চেয়ে এখানে কোথাও শুয়ে থাকো। শুনলে না—বললে, ঠিক চলে যাবো। দেখিস, কাজটা ঠিক তুলে দিস তোরা। বললাম, ঠিক আছে, যাও। আমরা তো আছি, কোনো অসুবিধে হবে না। তারপর হঠাৎ একটা কথা বললে, তুই আর দেবু থাকতে আমার ভাবনা কি, যদি মরেও যাই, তবু একটা ভরসা নিয়ে মরবো, তোরা দুজন তো আছিস।

বলতে বলতে মদনের চোখে জল এসে গেল। ভাঙা ভাঙা গলায় কথা শেষ করলে, তখন কি বুঝতে পেরেছিলাম, দাশুদা এই রকম একটা কাণ্ড করবে। হ্যাঁরে রেশমী, বাড়িতে কিছু ঝগড়াঝাঁটি হয়নি তো?

রেশমী চুপ করে থাকে। কাল যা ঘটেছিল, সে কথা তো বলার নয়। বরং সে কথাটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবার ভয়ংকর মুখটার দিকে একবার তাকলো রেশমী।

—যাক, তুই এখন বাড়ি যা রেশমী। মদন বললে, দেবু তোর সঙ্গে যাচ্ছে।

—আমি একাই যেতে পারবো মদনকাকা। রেশমী বললে, আমার পাড়ার রিকশা রয়েছে।

—কিন্তু আমি তো তোকে একা ছাড়তে পারি না মা।

দেবুকে ডাকলো মদন। চৌকশ ছেলে দেবু। এক নজরেই চোখে পড়ার মতো।

—দেবু, তুই রেশমীকে নিয়ে যা। আর শোন, আমি যতক্ষণ না যাই তুই থাকিস ওখানে।

রেশমীকে নিয়ে ছোটলালের রিকশাতেই উঠলো দেবু।

রিকশা স্টেশন রোডে পড়তেই পল্টনের সঙ্গে দেখা। সাইকেলে আসছিল পল্টন।

পল্টন কিছুটা দূর থেকে হাত দেখাতেই ছোটলাল রিকশা দাঁড় করালো। দেবু, পল্টন কেউ কারো অচেনা নয়। পল্টন ভ্রূ কুঁচকে দেখলো দেবুকে। কিন্তু তার বাঁকা চোখের চাউনিকে কোনো আমল দিলে না।

পল্টনের একটা হাত এখন রিকশার হ্যাণ্ডেলে। রেশমীর দিকে তাকিয়ে বললে, কিরে, বাবা বলে কেঁদেছিস তো? নাকি! সাজ-গোজের ঘটা তো দেখছি খুব।

রেশমীর গা-পিত্তি জ্বলে উঠলো। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে কোনো কথা বলা ঠিক নয়, বিশেষ করে দেবু যখন সঙ্গে রয়েছে।

সিগারেট ধরালো পল্টন। দেশলাই-এর জ্বলন্ত কাঠিটা বিচিত্র ভঙ্গিতে ছুঁড়ে দিলে। তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে দ্রুত সাইকেল ছুটিয়ে দিলে।

—পল্টন তো তোমাদের ওখানেই থাকে?

—হ্যাঁ। আপনি ওকে চেনেন?

—ওকে আবার চিনি না। পয়লা নম্বর মস্তান। দেবু বললে, তবে ও-ও আমাকে খুব ভালো করে চেনে। যাক সে-সব কথা।

ছোটলাল রিকশা ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে টাউন বাজারের পথে। রেশমী, দেবু দুজনেই চুপচাপ।

গুমটি মাঠে পৌঁছলো রিকশা। রেশমীদের ঘরের সামনে এখন বহু মানুষ জড়ো হয়েছে। লীলা দু-হাঁটুতে চিবুক রেখে ঘরের দরজার সামনে বসে।

লীলার কাছে গেল দেবু। লীলা তাকালো দেবুর মুখের দিকে। বললে, তুমি দেবু না?

—চিনতে পেরেছেন তাহলে।

লীলা মাথা নাড়লো। একটু চুপ করে থেকে বললে, সেই কবে দেখেছিলাম। তুমি তোমাদের দাদাকে রিকশা করে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিলে।

হেলতে দুলতে সোনামাসি এলো। রেশমীর কাছে এসেই বললে, এই—তুই মড়া ছুঁসনি তো রেশমী?

কথাটা খচ করে বিঁধলো রেশমীর মনে। কটমটিয়ে তাকালো সোনামাসির দিকে। চক্ষুলজ্জার বালাই নেই সোনামাসির। কথার জের টেনে বললে, মানুষ মরে গেলেই তো মড়া, আমি তো খারাপ কথা বলিনি। হ্যাঁরে, তোর বাপটা মরলো কেন বল তো?

রেশমী এবারে সাফ জবাব দিলে, বাবা তো আমাকে বলে যায়নি মাসি। এখন তো মরা মানুষটা কথা বলতে পারবে না, নয়তো জিগেস করতাম, তুমি কেন মরলে?

তবু লজ্জা নেই সোনামাসির। এগিয়ে গিয়ে বসলো লীলার গা ঘেঁষে। বললে, তোমার মেয়ের কথাবার্তা বড় কটকটে। জন্মের সময় ওর মুখে মধু দ্যাওনি ভালো মানুসের বৌ? বাপ মরেছে রেলে গলা দে, ও মেয়েকে দেখে কে বলবে এখন ওর কাটা বাপ পড়ে রয়েছে রেললাইনে—এত সাজ এখন মানায়?

রেশমী মুখ বুজে কথা সহ্য করার মতো মেয়ে নয়। তবু এই মুহূর্তে সে নিজেকে সামলে রেখেছে। ঘরে গিয়ে নতুন শাড়িটা ছেড়ে দেখে দেখে ময়লা ছেঁড়া শাড়ি বার করে পরলো।

দেবু অস্বস্তি বোধ করছিল এখানে বসে থাকতে। উঠে এলো। বসলো নিম্বেশ্বরতলায় বাঁধানো বেদীর কোণে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো।

বরফকলের দুজন কর্মীকে পাঠিয়েছে মদন মা-মেয়েকে নিতে। মর্গ থেকে দাশু সামন্তর কাটা-ছেঁড়া দেহটা নেবার জন্যে তাদের দরকার।

শুধু লীলা আর রেশমী নয়, গুমটি মাঠের কেউ কেউ গেল হাসপাতাল মর্গে।

মর্গ থেকে কজন লোক বার করে আনলো দাশু সামন্তর ধড় আর মুণ্ড। লীলা ডুকরে কেঁদে উঠলো। কিন্তু রেশমীর চোখে এতটুকু জল নেই। মর্গের কাছে গুলমোহর গাছের নিচে চুপচাপ বসে রইলো।

মৃতদেহ বাঁধা ছাঁদা হয়ে গেলে মদন এলো লীলার কাছে। বললে, বৌদি, আপনি চলে যান রেশমীকে নিয়ে।

লীলা তখনো কাঁদছে। মদনের কথায় তার কান্নাটা আরো চড়া পর্দায় উঠলো।

মদন এ-কথা সে-কথা বলে অনেক বোঝালো। শেষটা রেশমী এলো। বললে, চলো মা। আমরা আর কি করবো।

লীলা জড়িয়ে ধরলো রেশমীকে। বললে, বাড়ি গিয়ে কি করবো? ও ঘরে থাকবো কি করে?

রেশমী বললো, ও ছাড়া আর ঘর কোথায় পাবে মা। চলো।

দাশু সামন্তর দেহটা কাঁধে তুলে নিয়েছে বরফকলের কর্মীরা। গুমটি মাঠের কয়েকজনও সঙ্গে আছে।

দেবু ইতিমধ্যে একটা রিকশা ডেকে এনেছে। রেশমী একরকম জোর করেই মাকে রিকশায় তুললো। তবু লীলা রিকশা দাঁড় করিয়ে রাখলো, যতক্ষণ না শবযাত্রীরা চোখের আড়ালে যায়।

—চল্ না খুকি, শ্মশানে যাই।

—না।

—কিন্তু আমারও যে বাঁচার ইচ্ছে চলে গেছে খুকি।

রেশমী সে কথা কানে নিলে না। রিকশাওয়ালাকে বললে, চলো ভাই।

মা-মেয়ে গুমটি মাঠে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে পড়শিদের কেউ কেউ এলো। মামুলি কিছু কথা, কিছু উপদেশ শুনিয়ে যে যার চলে গেল।

মা-মেয়ে বসে রইলো বারান্দায়।

লীলা ভাবছে, এর পর না জানি আরো কত দুঃখ আছে জীবনে।

রেশমী ভাবছে তার নিজের কথা। এমন রেশম রেশম চুল, কটাশে চোখ, কাঁচা হলুদের মতো রঙ সে কোথায় পেল। মায়ের সঙ্গে তার কোথাও এতটুকু মিল নেই। আর যে মানুষটা আত্মহত্যা করেছে, এখন যার দেহটা পুড়ছে, যাকে বাবা বলে জানতো, সে কি সত্যিই তার বাবা নয়?

দাশু সামন্তর ভয়ংকর মুখটা রেশমী কিছুতেই ভুলতে পারছে না। ওই ভয়ংকর মুখ, যদিও মৃত্যুর আগে মুখটা অত ভয়ংকর ছিল না—ভাবতেই রেশমীর মনে কেমন যেন একটা ভয় চেপে বসছে।

একবার মনে হলো রেশমীর, এখনই সে মায়ের কাছে জানতে চাইবে, বলো আমি কে? দাশু সামন্ত বলে যে মানুষটা চলন্ত ট্রেনের নিচে গলা দিয়ে আত্মহত্যা করেছে, সে কে?

কিন্তু পরমুহূর্তে নিজেকে বোঝালো রেশমী, আমি জন্মেছি, আমি রেশমী নাম নিয়ে বেঁচে আছি, এর চেয়ে সত্যি আর কিছু নেই।

ঘরে এলো রেশমী। তক্তাপোশের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো।

রাত এগারোটা।

গুমটি মাঠ থেকে যে কজন গিয়েছিল শ্মশানে তারা ফিরে এলো। সঙ্গে মদন মাইতি আর দেবু।

লীলা এখন আর নতুন করে কাঁদলো না। রেশমী ঘরে ছিল, বেরিয়ে এলো।

মদনের হাতে ঠোঙা ভর্তি কচুরি আর কয়েকটা মিষ্টি। মা-মেয়ের জন্যে এনেছে।

—এগুলো নিন বৌদি। সারাদিন তো কিছু খাননি।

—আর খাওয়া। লীলা হাতে নিলে খাবারের ঠোঙা। চোখে তার নতুন করে জল এলো। এ কান্না শুধু একজন মানুষকে হারানোর দুঃখে নয়, এর মধ্যে আর এক যন্ত্রণাও মিশে আছে। সে যন্ত্রণার উৎসমুখ মনের গোপন কোণে।

—আমরা যাচ্ছি বৌদি। মদন বললে, আমি আর দেবু কাল সকালে আবার আসবো। গুমটি মাঠের ছেলেরাও কিছুক্ষণ থেকে যে যার ঘরে গেল। শুধু বসে রইলো রিকশাওয়ালা ছোটলাল। রেশমীকে যে নিজের দিদির মতো ভাবে।

—কিরে ছোটলাল, রেশমী বললে, তুই ঘরে যাবি না?

—যদি বলো আমি তোমাদের বারান্দায় শুয়ে থাকবো দিদি।

—নারে, মিছে কেন কষ্ট করবি। রেশমী বললে, তুই তো তোর দিদিকে জানিস।

—ঠিক আছে, আমি তাহলে যাই। দরকার হলে ডাক দিয়ো।

ছোটলাল চলে গেল। তারপরই অন্ধকারের মধ্যে এলো হারু বৈরাগী আর তার বৌ যমুনা। যমুনার হাতে একটা বড় এলুমিনিয়মের বাটি।

—এসো বৈরাগী কাকিমা।

বাটিটা এগিয়ে দিলে যমুনা। বললে, এতক্ষণ আসি আসি করেও আসতে পারিনি। এতে চিঁড়ে আছে। বাটিটা রাখ।

—খাবার আছে কাকিমা। রেশমী বললে, কারখানার মদন কাকা এনেছে।

—তা হোক, এনেছি যখন রেখে দে। শুকনো চিঁড়ে, নষ্ট তো হবে না।

বাটিটা হাত পেতে নিলে রেশমী। বললে, বোসো তোমরা।

—এখন আর বসবো না। কাল আবার আসবো। শোন—কাকিমা বলে ডাকিস, কিছু দরকার হলে বলবি।

লীলা বললে, একটু বসবে না?

—না দিদি, ছোট মেয়েটার জ্বর হয়েছে। এখনো ঘুমোয়নি। এখন যাই কাল আবার আসবো।

হারু বললে, আসা-যাওয়া আর কি। মুখোমুখিই তো ঘর। শুধু পা বাড়ানো নিয়ে কথা।

হারু বৈরাগী আর যমুনা চলে গেল।

রেশমীর দিকে খাবারের ঠোঙাটা এগিয়ে দিলে লীলা। বললে, যা হোক একটু মুখে দে।

—যা হোক কেন, আমার ক্ষিধে পেয়েছে, আমি খাবো। রেশমী খাবারের ঠোঙা হাতে নিয়ে বললে, শোক বলো, দুঃখ বলো সবই তো ফুরিয়ে যায়। তাই না? কিন্তু ক্ষিধেটা থাকে। ফুরোয় না।

লীলার কানে মেয়েব কথাগুলো কেমন বেসুরো লাগলো। কিছুটা বিরক্তি নিয়ে তাকালো ময়ের মুখের দিকে। রেশমী তখন কচুরী মুখে দিয়েছে। বলে, তুমি তো আমার সত্যি মা। না, তুমিও কোনোদিন বলবে, আমি তোর সত্যি মা নই।

—খুকি! লীলা অস্থির হয়ে ওঠে।

রেশমী হাসে। তার হাসিটা করুণ। বলে, মা—আমি তোমার কাছে কোনোদিন কিছু জানতে চাইবো না। আমি জানি, আমি তো মিথ্যে নই। আমি জন্মেছি, আরও মানুষের মতো।

লীলার চোখ দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরে পড়ে। রেশমী খাবারের ঠোঙাটা এবারে মায়ের দিকে এগিয়ে দেয়। বল্লে, তুমি একটু খাও মা।

খাবারের ঠোঙা হাতে নিলে লীলা। বললে, চল—ঘরে চল।

মা-মেয়ে ঘরে আসার সঙ্গে সঙ্গে টিয়াপাখিটা বারান্দা থেকে ডেকে উঠলো তারস্বরে। খাঁচাটা ঘরে তোলা হয়নি।

রেশমী বারান্দায় এলো। দেখলো, খাঁচার নিচে পাড়ার বাউণ্ডুলে হুলো বিড়ালটা। ওটা প্রায়ই আসে। পাখিটাকে উৎপাত করে।

টিয়াটা রেশমীর। আদর করে নাম রেখেছে শ্যামলী। নাম ধরে ডাকলে সাড়া দেয়।

এতক্ষণে রেশমীর মনে হলো, শ্যামলী আজ সারাদিন কিছু খায়নি।

গুমটি মাঠে এখন গভীর রাত। কিন্তু এ-রাতের মতো রাত আসেনি রেশমীদের ঘরে। মেঝের ওপর হাতে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে লীলা। খাবারের ঠোঙা পাশেই পড়ে আছে। কটা আরশোলা খাবারের ঠোঙার ওপর। রেশমীর চোখে ঘুম নেই। সে চেয়ে আছে মায়ের মুখের দিকে। হ্যারিকেনের আলো পড়েছে মায়ের মুখের ওপর! মুখের প্রতিটি রেখা স্পষ্ট। দুঃখের রাংতায় জড়ানো বলেই বোধহয় মায়ের মুখ এমন সুন্দর লাগছে। মায়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে রেশমীর দু চোখে গভীর ঘুম নামলো।

দুঃখের রাতও শেষ হয়। প্রতিদিনের নিয়মে আজও গুমটি মাঠের রাত শেষ হয়ে আসছে হারু বৈরাগীর প্রভাতী নামগানে। একই নিয়মে দিন আরম্ভ হচ্ছে গুমটি মাঠে।

শুধু একটি মানুষই আজ নেই। সে মানুষ দাশু সামন্ত। কিন্তু সে মানুষের অভাবে গুমটি মাঠের চলমান জীবনে কোথাও যতি চিহ্ন পড়েনি।

একটু বেলা হতে মদন আর দেবু এলো। গতকাল দাশু সামন্তর সৎকারে যা কিছু খরচখরচা তারাই করেছে। কাল আর এ সব নিয়ে কোনো কথা হয়নি। আজ লীলা নিজে থেকেই কথা তুললে।

মদন বললেন, ও কথা বলে আমাদের ছোট করবেন না বৌদি। এখন বলুন, আজ বাদে কাল তো কাজ, কিছু তো করতে হবে।

লীলার চোখ জলে ভরে উঠলো। বললে, আমি আর কি বলবো বলো। শ দেড়েক টাকা আছে, আর ব্রোঞ্জের ওপর সোনার পাত মোড়া চারগাছা চুড়ি আছে—

—বৌদি, ও কথা শোনার জন্যে আসিনি। মদন বললে, মালিকের ছেলে নিজে থেকে পাঁচশ টাকা দিতে চেয়েছে, এছাড়া আমরাও কিছু কিছু দেবো—এখন কি ভাবে কি করা যায় বলো। শ্মশান-বন্ধুদের তো বলতে হবে। এ-ছাড়া আরো দু-পাঁচজনকে বলা দরকার।

—আমি আর কি বলবো বলো। তোমরা যা ভালো বুঝবে তাই করবে।

এরপর রেশমীকে ডাকলো মদন। জানতে চাইলো তার ইচ্ছের কথা।

রেশমী বললে, আমি ওসব জানি না। একজন মানুষ মরে গেছে, ব্যস—সেই সঙ্গে তার সবকিছু শেষ হয়ে গেছে।

কথাটা মেনে নিতে পারলো না মদন। লীলাও ব্যথা পেল মেয়ের কথায়। কিন্তু দেবু যেন কিছুটা খুশিই হয়েছে।

মদন মাইতির ইচ্ছাতেই সব কিছু হলো। নিম্বেশ্বরতলায় ত্রিপলের ছাউনির নিচে দাশু সামন্তর শেষ কাজ হলো। শ্মশান-বন্ধু ছাড়া গুমটি মাঠের এ-ঘর, ও-ঘর থেকে এক-আধজনকে বলেছিল লীলা। তারপর নিজের ইচ্ছায় হারু বৈরাগী সন্ধ্যায় মাথুর গাইলো। হারুর বৌ-এর যখন প্রথম বাচ্চা হয়, তখন যমে-মানুষে টানাটানি হয়েছিল। সেই অসময়ে দাশু তাকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিল। সেই টাকা দিতে গেলেও নেয়নি দাশু। সেই ঋণের কিছুটা শোধ করলো হারু মাথুর গেয়ে।

সব কিছু চুকে গেল। দাশু সামন্ত মানুষটা এখন শুধু স্মৃতি। ভয়ঙ্কর স্মৃতি।

কিন্তু এরপর ?

অনেক ভাবনা চিন্তা করে লীলা ধরলো পড়শি হাবুর বৌকে। পঙ্গু হয়ে আছে হাবু। কোনো রকমে ঘষতে ঘষতে ঘরের বাইরে আসে। নয়তো ওঠার ক্ষমতা নেই। এ ছাড়া একটা পাঁচ বছরের

বাচ্চাও রয়েছে। হাবুর বৌ সংসারটাকে যেমন করে হোক চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কাছারি পাড়ায় এক বাবুর বাড়ি রান্না করে। নিজের খাওয়া-পরা ছাড়াও মাস গেলে পঞ্চাশটা টাকা পায়। তাছাড়া রোজই দুপুরে, রাত্রে বাড়ি আসার সময় যা হোক কিছু খাবার নিয়ে আসে। ওই রকম একটা কাজ পেলে, দুটো প্রাণ যা হোক করে বেঁচে থাকতে পারবে।

হাবুর বৌ বললে, ঠিক আছে, তেমন পেলে তোমারে আমি বলবো কাকিমা।

কিন্তু রেশমী বাদ সাধলো। বললে, আমি থাকতে তুমি কাজ করবে কেন?

লীলা বললে, তুই কি করবি?

রেশমী বললে, দেখি কি করি। তবে একটা কিছু পথ বার করবো।

লীলার মনটা দুলে উঠলো। এই রূপ-যৌবন নিয়ে কোথায় যাবে, রেশমী কি কাজ করবে!

মায়ের ভয়টা অনুমান করে রেশমী। বলে, ভয় নেই মা—এ মেয়ে সে মেয়ে নয়।

লীলা বললে, সেই জন্যেই তোকে নিয়ে আমার এত ভয় খুকি।

রেশমী হাসলো। বললে, ভয় করো না—আমার চোখের দিকে চেয়ে ত্যাখো তো?

—যা তোর সব সময়ে পাকামি। লীলা আর কথা বাড়ালো না।

রেশমী একটা কাজের পথ বার করেছে, কিন্তু এখনো সে মাকে বলেনি। বললে এখনি হয়তো 'না-না' করে উঠবে।

এখানকার ক'জন মেয়ে-বৌ যায় টাউন বাজারে চিংড়ি মাছের আড়তে। দশ-বারোটা আড়ত হয়েছে। কাজ বলতে বাগদা আর গলদা চিংড়ির মাথা ছাড়ানো। বেলা বারোটা থেকে কাজ আরম্ভ,

রাত দশটায় শেষ। যেমন কাজ তুলতে পারবে তেমন পয়সা। কিছু না হোক, পনেরো-কুড়ি টাকা কাজের শেষে আঁচলে বেঁধে আনে সবাই। এ ছাড়া বাড়তি পাওনা খানিকটা চিংড়ি মাছের মাথা। সেগুলো কেউ ঘরে এনে খায়, নয়তো এক-দেড় টাকায় বেচে দেয়।

রেশমী বলেছে নাটুর বৌকে। নাটুর বৌ বলেছে, এর আর বলা কওয়ার কি আছে। গেলেই কাজ। আর তোর মতো মেয়ে—একবার গিয়ে দাঁড়ালেই হলো।

শেষের কথাটা ভালো লাগেনি রেশমীর। কিন্তু নাটুর বৌ এমনিতে ভালো।

গা-গতর আছে নাটুর বৌ-এর। হুড়ুম-দাড়ুম খাটতেও পারে। মেয়েছেলে হলে কি হবে, পুরুষ মানুষের এক কাঠি বাড়া। যৌবন-কালের বিধবা, কিন্তু কেউ এখনো একটা কথা বলতে পাবেনি।

মনে মনে ঠিক করেছে রেশমী, চিংড়ির আড়তের কাজ সে করবে।

কথাটা বলতে গেল নাটুর বৌকে। নাটুর বৌ বললে, তুই পারবি তো ওখানে কাজ করতে ?

—কেন পারবো না। রেশমী বললে, বাঁচতে তো হবে।

—বাঁচতে গিয়ে শেষটা না—কথা শেষ করে না নাটুর বৌ।

—বাঁচতে জানলেই বাঁচা যায়। রেশমী বলে, আমি গতরে খেটে রোজগার করবো, দেখি না কি হয়। কাজ আমি করবো।

সন্ধ্যের মুখোমুখি 'একটু ঘুরে আসছি' বলে লীলা কোথায় যেন গেল। বাড়িতে রেশমী একা। আগে কখনো ঘরে বসে থাকতো না রেশমী। যখন যেখানে খুশি ঘুরতো, বেড়াতো। এই নিয়ে কম কথা শুনতে হতো না তাকে। ঘরে-বাইরে অনেকেই শোনাতো। কিন্তু কোনো কথায় কান দিত না রেশমী।

দাশু মারা যাবার পর রেশমী আর ঘরের বার হতে চায় না।

মনের মধ্যে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে আছে সেদিনের কথাগুলো। বার বার তার মনে হয়, এমন রেশম-রেশম চুল, কটাশে চোখ, কাঁচা হলুদের মতো গায়ের রঙ কোথায় পেল সে।

শুধু তাই নয়, দাশু সামন্তকে সে বাবার আসন থেকে সরিয়ে দিয়েছে। তবে সে কথাটা বাইরে প্রকাশ করে না।

এত সময় একলা ঘরে আরশিতে মুখ দেখছিল রেশমী: এরই মধ্যে তার মনে পড়লো বাবলুকে। বাবলু সেই যে গেছে, তারপর তার আর কোনো খবর নেই। একটা চিঠিও তো দিতে পারতো। বলেছিল, মাস খানেকের মধ্যে ফিরবে, কিন্তু দু মাস হয়ে গেল তার কোনো পাত্তা নেই।

বসিরহাট—কলকাতা লাইনে বাস কনডাক্টরি করতো বাবলু। কনডাক্টরি করতে করতে ড্রাইভারী শিখেছিল সর্দারজীর কাছে। ওর ইচ্ছে পাকা ড্রাইভার হবে। রেশমীকে বললো, আমি ড্রাইভারী শিখে কিছুদিন চাকরি করবো। তারপর টাকা জমিয়ে একটা অটো রিকশা কিনবো। আর সেই অটো রিকশার প্রথম সওয়ারী হবে তুমি।

আরো কত কথা বলতো বাবলু। অবাক হয়ে শুনতো রেশমী। মাঝে মাঝে রিজার্ভ বাসের যাত্রী নিয়ে কত দূর দেশে গেছে সে। পাহাড় দেখেছে, সমুদ্র দেখেছে, অনেক শহর দেখেছে। অটো রিকশা কিনে সেই সব সুন্দর জায়গায় রেশমীকে নিয়ে বেড়াতে যাবে।

বাবলু আরো কত কথা বলতো, কত গল্প শোনাতো। যে সব কথা, যে সব গল্প রেশমীর কাছে স্বপ্নের মতো।

রেশমীর জীবনের যা কিছু স্বপ্ন সবই বাবলুকে নিয়ে। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় আজকাল, সব কিছুই না স্বপ্নের মতো মিথ্যে হয়ে যায়। স্বপ্ন তো সত্যি হয় না।

ভাবনায় ছেদ পড়ে। সিগারেটের গন্ধ আসছে। রেশমী উঠে

জানালার কাছে আসে। আধা-অন্ধকারের মধ্যে লক্ষ্য করে নিম্বেশ্বরতলায় দাঁড়িয়ে কে একজন সিগারেট টানছে।

হাত বাড়িয়ে তাকের ওপর থেকে টর্চটা নিলে রেশমী। টর্চের আলো ফেলতেই দেখলো, নিম্বেশ্বরতলায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে পল্টন।

॥ তিন ॥

টাউন বাজারের শেষ প্রান্তে চিংড়ি মাছের আড়ত। বেশ কয়েকটা।

নাটুর বৌ-এর সঙ্গে রেশমী এলো বদরুদ্দিন গাজীর আড়তে। নাটুর বৌ এই আড়তেই কাজ করে।

লীলা বার বার বলেছিল, কাজটা তুই ভালো করছিস না খুকি। শেষটায় পস্তাবি।

মায়ের কোনো কথাই কানে নিলে না রেশমী। নাটুর বৌ-এর সঙ্গে চলে এসেছে বদরুদ্দিন গাজীর আড়তে।

মালিক বদরুদ্দিন সন্ধ্যের দিকে আসে। তাও বেশীক্ষণ থাকে না। আড়ত দেখাশোনা করে গোলাম মোল্লা আর নবী। ওরা মালিকের পেয়ারের লোক। আপনজন।

রেশমীর কথা গোলাম মোল্লাকে বলে রেখেছিল নাটুর বৌ। গোলাম বলেছিল, নিয়ে আসিস, দেখবো।

গোলাম মোল্লা এখন রেশমীকে দেখছে। চোখ টান টান করে দেখছে। রেশমীর মতো চনমনে মেয়ে দাঁড়িয়ে কাঠপুতুলের মতো। আড়তের মধ্যে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আঁশটে গন্ধে তার গা গুলিয়ে উঠেছে। একটুতেই এই অস্বস্তি, এখানে তাকে কাজ করতে হবে দিনের পর দিন—সেই কথাটাই এখন ভাবছে রেশমী।

শুধু গোলাম মোল্লা নয়, আড়তে সবার নজর এখন রেশমীর

দিকে। মুহুরী মানিক সরকার তো হাঁ হয়ে গেছে রেশমীকে দেখে। ট্যারা চোখে দেখছে।

গোলাম মোল্লার বয়স হয়েছে, কিন্তু চেহারাটা মজবুত। লুঙ্গির ওপর চিকনের কাজ করা অর্গ্যাণ্ডির ফিনফিনে পাঞ্জাবি পরে বসে আছে তক্তাপোশে। ঠোঁটে শ্বেতী হয়েছে। দাঁতগুলো আতা-বিচির মত কালো। মুখে সব সময় পান জর্দা ঠাসা। পিকদানিটা মুখের কাছে তুলে ওয়াক করে খানিকটা থুতু ফেললো গোলাম। রেশমীকে দেখে বেসামাল হয়ে গিয়েছিল, খানিকটা থুতু পড়লো সাদা পাঞ্জাবিতে। বেশমী বিশ্রী অস্বস্তি বোধ করে।

—তোমার নাম কি?

—রেশমী।

—পারবা তো একাজ করতি?

—না প্যারার কি আছে।

—হ্যাঁ, চিংড়ির মাথা ছাড়ানো আর এমন কি কাজ।

রেশমীর সর্বাঙ্গ শিরশির করে উঠলো। কী নোংরা ইঙ্গিত লোকটার কথা বলার ধরনে, কিন্তু নিজেকে সামলে রাখলো সে।

গোলাম বুদ্ধিমান লোক। বুঝতে পেরেছে তার কথা বলার ধরন মেয়েটা পছন্দ করেনি। শুধরে নিয়ে ভদ্রভাবে ফের বললে, চিংড়ির মাথা ছাড়ানো এমন কিছু কঠিন নয়। তবে রপ্ত করতি দু পাঁচ দিন লাগবে। এতো সর্বাঙ্গের কাজ নয়, দু হাতের দুই-দুই চার আঙুলের খেলা। যাও—কাজে লেগে যাও।

রেশমী একবার চারদিকে চোখ ফেললো। খুরশি পিঁড়িতে উবু হয়ে বসে চিংড়ি মাছের ধড় থেকে মাথাগুলো ছাড়িয়ে ফেলছে মেয়েরা। মেশিনের মতো চলছে হাতের আঙুল। ধরছে আর ছাড়াচ্ছে।

রেশমী খানিক সময় দেখলো। তারপর নাটুর বৌ-এর পাশে

খুরশি পিঁড়ির ওপর বসে গেল উবু হয়ে। হাত লাগালো কাজে। নাটুর বৌ যতক্ষণে দশটা মাথা ছাড়ায়, রেশমী ততক্ষণে একটা। নিজেরগুলো আলাদা করে রাখছে রেশমী।

এদিক-ওদিক দেখছে রেশমী। মেয়েরা লাইনবন্দী হয়ে কাজ করছে কয়েকটা দলে ভাগ হয়ে। কাজ করছে হাতে, কথা চলছে মুখে। রঙ-তামাশার কথা। কথার মধ্যে অনেক নোংরা গা-ঘিনঘিন করা কথাও মিশে থাকছে।

এত সময় তক্তাপোশের ওপর গোলাম মোল্লা একাই ছিল, এখন কয়েকজন ফড়ে-ব্যাপারী এসে বসেছে। গোলামের নজর ঘুরে ফিরে রেশমীর ওপর পড়ছে।

ও-পাশে গোলাম মোল্লার মুখোমুখি একটি কালো-বৌ কাজ করছে। নাম আয়না বিবি। গড়ন-পেটন যেমন, তেমনি চোখ-মুখও কাটাকাটা। রঙটাই শুধু কালো, নয়তো চেহারায় কোনো খুঁত নেই।

নাটুর বৌ ফিসফিসিয়ে বলে, ও হলো নবী মিয়ঁার পেয়ারের। এ আড়তে আয়নার র‍্যালা কত। আর ওই যে দেখছিস, কোণে বসে কাজ করছে—ছিপছিপে চেহারার বৌ—ওর নাম মালতী, আমাদের ওদিকেই থাকে শোনপুকুরের কাছাকাছি—ওর মতো নচ্ছার মেয়েমানুষ এ আড়তে নেই। ওর বর বাজারে কাঁচা তরকারি বেচে।

মালতী কাজ করছে উবু হয়ে বসে। হাঁটু অব্দি বিশ্রীভাবে তুলে রেখেছে শাড়ি। বুকের ওপর আঁচলটা আছে নামেই। ব্লাউজের ওপরের বোতামটা খোলা।

—গোলাম মোল্লা ওই মালতীর কব্জায়। নাটুর বৌ বলে, এ কাজটা ওর লোক-দেখানো। ও কাজে না এলে গোলাম মোল্লার মেজাজ বিগড়ে থাকে। মালতী সমানে বসে থাকবে শরীরের জানালা দরজা খুলে।

রেশমী কাজ করছে এই পর্যন্ত। আঁশটে গন্ধে তার পেটের

নাড়িভুঁড়ি গুড়গুড় করছে। তারপর যখনই চোখ পড়ছে গদির দিকে, তখনই দেখছে গদির ওপর বসা পুরুষদের কারো-না-কারো চোখ তার ওপর। চোখাচোখি হতেই গা শিরশিরিয়ে উঠছে রেশমীর। হোঁৎকা গোলাম মোল্লার মুখের দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে রেশমীর মনে হচ্ছে, মুখটা মানুষের মুখ নয়।

নাটুর বৌ বলে, এদিক-ওদিক না তাকিয়ে বসে কাজ কর।

রেশমী কাজে মন দিলে। চোখ নাই-বা ফেরালো, কিন্তু কানে তো তুলো দিয়ে বসে থাকতে পারে না। বিশ্রী বিশ্রী টুকরো কথা ভেসে আসছে তার কানে।

বেলা তিনটে নাগাদ খানিক সময়ের জন্যে জিরেন। নাটুর বৌ ন্যাকড়ায় বেঁধে রুটি-তরকারি এনেছে। রেশমী খেতে চায়নি, তবু নাটুর বৌ তাকে না দিয়ে খেতে পারলো না।

আড়তের মধ্যেই টিউবওয়েল। ওখানে বারোয়ারী গ্লাসে ঠোঁট দেয়ার কথা ভাবতেই পারে না রেশমী। আঁজলা ভরে জল খেতে গিয়েও পারলো না। হাতে আঁশটে গন্ধ।

চারটে না বাজতে আড়ত আরো জমজমাট হয়ে উঠলো। চিংড়ি বোঝাই এক-একটা টেম্পো কিংবা চার চাকার ম্যাটাডোর আসছে। সে চিংড়ি ওজন হচ্ছে কাঁটায়। তারপর ঢেলে দিচ্ছে আড়তের চাতালে সেই সঙ্গে আসছে মেছোঘেরির লোকজন। ভিড় বাড়ছে গদির চারপাশে। চলছে উঁচু-নিচু গলার কথা, চলছে টাকার লেনদেন। নোট এখানে উড়ছে।

আড়তের নজর কেড়েছে রেশমী। আয়না বিবির গা জ্বলছে। মালতীর মুখ গোমড়া। সে দেখেছে, গোলাম মোল্লার নজর আজ রেশমীর দিকেই পড়ছে। তবু এখনো নবী মিয়াঁ আসেনি। এ-ছাড়া সাতকড়ি হালদার এলে তো সোনায় সোহাগা।

আয়না বিবি কাজের ফাঁকে একসময় রেশমীর সঙ্গে আলাপ করতে

এলো। পাশে উবু হয়ে বসে নিচু গলায় বলে, কিগো আঁশটে বাস কেমন লাগতেছে?

রেশমী বলে, যেমন লাগে।

আয়না বিবি বলে, পারবা তো এ কাজ করতি?

রেশমী বলে, আজই তো এলাম।

আয়না সুর টেনে বলে, সে তো চোখেই দেখলাম। দেহেও তোমার বাড়ন্ত যৌবন, রূপেরও চেকনাই আছে। পারবে ধরে রাখতে?

রেশমীর ফর্সা মুখ লাল হয়ে ওঠে।

পাশে যদিও নাটুর বৌ, কিন্তু সব কথা তার কানে যায়নি। যেটুকু কানে গেছে, সেটুকু শুনেই বলে, আজ ও নতুন এয়েচে, দুদিন যাক-আসুক, আড় ভাঙুক—তারপর ওসব বলিস। তা ছাড়া—

কথা শেষ না করে চোখ ঠেরে নাটুর বৌ কি যেন ইঙ্গিত করলে আয়নাকে। কিন্তু আয়না তবুও বলে, আড়তদারেরা হলো রক্তচোষার জাত, ওরা যেমন চুষছে তেমনি যত পারবে চুষে নেবে ভালো মানুষের মেয়ে।

রেশমী অন্যমনস্ক হয়ে ছিল, আচমকা গলদা চিংড়ির মাথার শক্ত 'হুমো' ফুটে গেল হাতের আঙুলে। 'হুমো' টেনে তুলতেই যেমন রক্ত, তেমন জ্বলুনি।

—এই রে। নাটুর বৌ বলে, ভালো করে চোষ—রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে।

শেষটা নিজের রক্ত নিজে চুষবে। আয়না চোখ ঠ্যারায় বিশ্রী ভঙ্গি করে।

চিংড়ির ঘিলুমাখা আঙুল মুখে দিতেই গায়ের মধ্যে পাক দিয়ে উঠলো রেশমীর। বার কতক 'ওয়াক ওয়াক' করলো। একগাল থুতু নিয়ে বাইরে এলো ফেলতে।

বিকট আওয়াজ তুলে একটা ঝকঝকে মোটর বাইক এসে দাঁড়ালো

আড়তের সামনে। নবী মিয়াঁ এলো।

নবী মিয়াঁর পরনে টেরিকটের পাজামা, গায়ে সবুজ রঙের টেরিকটের পাঞ্জাবি। চোখে রঙিন চশমা। মোটর বাইক ছুটিয়ে আসার দরুন মাথার শ্যাম্পু করা চুল উস্ক-খুস্ক। মোটর বাইক থেকে নেমেই পকেট থেকে চিরুনী বার করে চুল আঁচড়ে নিলে নবী। নবী মিয়াঁর ডান হাতের আঙুলে হীরের আংটি জ্বলছে।

রঙিন চশমার আড়াল দিয়ে রেশমীকে দেখলো নবী মিয়াঁ। রেশমী তাড়াতাড়ি নিজের জায়গায় এসে বসে পড়লো। গট-গট করে নবী মিয়াঁ ভিতরে চলে এলো রঙিন চশমাটা এখন তার হাতে।

রেশমীর আঙুলে এখনো রক্ত ঝরছে।

নাটুর বৌ গেল গোলাম মোল্লার কাছে। গোলাম মোল্লাকে চাচা বলে ডাকে সে। বললে, চাচা ওষুধ-টষুধ আছে?

—কেন কি হয়েছে?

—রেশমীর আঙুলে 'হুমো' ফুটেছে।

—ওরে অ রামু, গোলাম চিৎকার করে বললে, দ্যাখ তো ও কামরায় আইডিন টাইডিন আছে কিনা।

ছোকরা বয়সের রামু, আড়তে ফাইফরমাশ খাটে। কামরা থেকে একটা ওষুধের শিশি আর তুলো বার করে গোলামের হাতে দিলে।

গোলাম ডাকলো, এই রেশমী, এদিকে এসো।

রেশমী পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো। গোলাম নিজের হাতে রেশমীর আঙুলে আইডিন লাগিয়ে তুলো দিয়ে চেপে ধরলো। বললে, ন্যাকড়া-ট্যাকড়া পেলি ভালো হতো। বেঁধে দেতাম।

মালতী কাজ করছিল। উঠে এসেছে। কোনো কথা না বলে শুধু কটমটিয়ে তাকিয়েছে গোলামের দিকে।

আড়তে তখন চাপা গুঞ্জন। নবী মিয়াঁ গদীর পাশে দাঁড়িয়ে

ঘাড় মুখের ঘাম মুছছে, আর চোখ দিয়ে চাটছে রেশমীকে। আয়না মুখ গোমড়া করে বসে আছে।

গোলাম বললে, আজ আর তোমার কাজ করতি হবে না। ঘরে যাও।

রেশমী কেমন থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। গোলাম পকেট থেকে দশটা টাকা বার করে রেশমীর দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিলে। বললে, এটা রাখো। দশ টাকার কাজ হয়নি, তবু রেখে দ্যাও। এটা হিসেবের বাইরে।

বেহিসেবী কাজ করার মানুষ নয় গোলাম। যা কিছু করে হিসেব করেই করে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও রেশমী টাকাটা হাতে নিলে।

আয়নার দুটো চোখ তখন জ্বলছে।

আড়ত থেকে বেরিয়ে এলো রেশমী। আঙুলটা ভীষণ জ্বালা করছে। রিকশা ধরার জন্যে দাঁড়ালো রাস্তায়। দেখা হয়ে গেল সোহাগীর সঙ্গে। রেশমীদের পাশের পাড়ার মেয়ে। চিংড়ির আড়তেই কাজ করে। তবে এ আড়তে নয়।

সোহাগী কথা বলার আগেই দাঁত বার করে হাসে। এখানেও সেই হাসি। বললে, আমি শুনছি, তুই আইছিস কাম করতি।

এতদিন শহরের কাছাকাছি থেকেও সোহাগীর কথায় বাঙ্গাল দেশী টান এখনও যায়নি।

রেশমী বললে, বাড়ি যাচ্ছি—আঙুলে চিংড়ির হুমো ফুটেছে।

সোহাগী বললে, এহানে এহন কতো কি ফোটবো! শরীর মন সব ঝাঝরা হইয়া যাইবো। তুই এহানে না আইলে ভালো করতিস রে। ঠিক আছে, বাড়িতে যা—পারিস তো সময় কইরা আমার লগে দেখা করিস।

বাড়ি এসে বসলো না রেশমী, সাবান গামছা নিয়ে পুকুর-ঘাটের দিকে চললো। মা বারণ করলে, নাই-বা গেলি পুকুরে, তোলা জল

আছে, ওতেই হাতে মুখে সাবান দিয়ে গা-মাথা মুছে নে। কিন্তু কথা কানে নিলে না রেশমী, ভরসন্ধ্যেয় একা চললো পুকুরঘাটে।

ঘাটে দেখা হয়ে গেল ননীর সঙ্গে। স্টেশনে চায়ের দোকান আছে ননীর। শেষ ট্রেন না গেলে কোনো দিন বাড়ি আসে না।

—কি ননীদা তুমি দোকানে যাওনি ?

—গিয়েছিলাম। চলে এইছি। ছেলেটার জ্বর। আমি ছাড়া তাকে আর কে দেখবে বল ? ঠাকুমা সামলাতে পারে না নাতিকে।

ননীর বৌ মরেছে মাস ছয়েক হলো। এমনিতে ভালো মানুষ ননী, বৌ মরতে আরো হাবাগোবা গোছের হয়ে গেছে। বুড়ি মা, আর ছ বছরের ছেলে রণ্টু—এই নিয়ে আছে ননী।

লোকে কত বলেছিল, ননী তুই বিয়ে কর, এমন কি আর বয়েস তোর। কিন্তু সে কথায় কান দেয়নি ননী। তার কথা হলো, সংসার তো আছে, নাই-বা রইলো বৌ। ছেলেটাকে নিয়েই সে দিন কাটাবে।

রেশমীর সঙ্গে মেলামেশা ছিল ননীর বৌ হেনার। হেনার মনটাও ছিল ভালো। হেনা বৌদিকে মনে পড়লে এখনো রেশমীর মনটা হু হু করে ওঠে।

ননী গা ধুয়ে উঠে যাচ্ছিল। বললে, মাঝে মাঝে আসতে তো পারিস। তোদের বৌদি না হয় নেই, রণ্টু তো আছে। সে তো প্রায়ই তোর কথা বলে।

—ঠিক আছে, যাবো ননীদা।

ননী তবু দাঁড়িয়ে রইলো ঘাটের ওপর। রেশমী বললে, আর কিছু বলবে ননীদা ?

—হ্যাঁরে, তুই চিংড়ি মাছের আড়তে কাজ করতে যাচ্ছিস ? সত্যি ?

—ওর চেয়ে ঘরে বসে কাগজের ঠোঙা তৈরি কর। ননী বলে, ও কাজে আর যাস নে।

ননী চলে গেল। ভালো করে সাবান মেখে রেশমী ডুব দিয়ে স্নান করলো। এতক্ষণে যেন আঁশটে গন্ধটা ছাড়লো।

পুকুরঘাট থেকে ভিজে কাপড়েই আসছিল রেশমী। হঠাৎ খিড়কির দিকের রাস্তায় মুখোমুখি হলো পল্টনের।

আকাশে ভাঙা চাঁদ ছিল। না-আলো, না-অন্ধকারে রেশমীর ভিজে শরীরটা দেখলো।

—কি দেখছো?

—তোকে।

—দ্যাখো, ভালো করে দ্যাখো। উঁ, বলে দুপদাপ পা ফেলে রেশমী পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায়।

—এ্যাঃ, কী আঁশটে গন্ধ রে। বলে পল্টন একটা নোংরা মন্তব্য ছুঁড়ে দিলে।

রেশমীর ইচ্ছে হলো দু-কথা শুনিয়ে দেয়। কিন্তু কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিলে।

বাড়ি এসেই দেখলো, সোনামাসি বারান্দার কোণে বসে মায়ের সঙ্গে ফিসির ফিসির কথা বলছে।

এরই মধ্যে নিম্বেশ্বরতলায় হরিলুট দিতে এলো মুকুন্দ বাউরির পরিবার-পরিজন। মুকুন্দর নাতির অসুখ করেছিল। তারই জন্যে মানত ছিল, নাতি ভালো হয়ে উঠলে তারই ওজনে বাতাসা-কদমা লুট দেয়া হবে নিম্বেশ্বরতলায়। হারু বৈরাগীকে বলে রেখেছিল মুকুন্দ, এদিনে সন্ধ্যায় নামগান করার কথা।

নামগান আরম্ভ হলো। খোল বাজাচ্ছে হারু, করতাল নিয়েছে হারুর মেজছেলে চাঁদু, আর গান গাইছে ওর দুই মেয়ে ললিতা আর বিশাখা। শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম গাইছে ওরা।

ঘরে বসে আছে রেশমী। আঙুলটা টাটাচ্ছে। একটু ফুলেও উঠেছে। চুন লাগিয়ে দিয়েছে যদি ব্যথাটা কমে।

লীলা ডাকলো, কিরে খুকি, বাইরে আয়। হরিলুট হচ্ছে ঘরের

সামনে আর তুই ঘরে বসে আছিস ?

রেশমী ভিতর থেকে সাড়া দিলে, আমার ভাল লাগছে না। আমি এখন যাবো না।

সোনামাসির মন্তব্য কানে এলো, আজকালকার ছেলেমেয়েদের কথা আর বোলো না, ওরা এক ধাঁচের। সেদিন পল্টনরে বললাম, আমায় একবার নবদ্বীপ ঘুরিয়ে আনবি, বললে—এখন কি আর নিমাই-এর কাল আছে যে নবদ্বীপ যাবে। এখন আমাদের কাল, আমাদের লীলা দ্যাখো।

নিম্বেশ্বরতলায় জড়ো হয়েছে গুমটি মাঠের ছেলে-মেয়েরা। গিন্নিবান্নিদের কেউ কেউও এসেছে। নামকীর্তন শেষ হতে কদমা-বাতাসা ছড়াতে লাগলো মুকুন্দ। হরির নামে জয়ধ্বনি দিলে হারু। ছেলেমেয়েরা হুমড়ি খেয়ে কুড়োতে লাগলো ছড়ানো বাতাসা-কদমা। যে যত পারে।

লীলা আবার গলা চড়িয়ে ডাকলো মেয়েকে।—তোর কি আক্কেল রে, ঘরের দোরে হরিলুট হচ্ছে, আর তুই বসে রইলি ঘরে ?

ঝাঁঝ নিয়ে রেশমী বাইরে এলো। বললে, তুমিও তো যেতে পারতে।

—তাই যাচ্ছি। লীলা একটু ঠেস দিয়ে বললে, মেয়ে আমার কাজ করে এলেন।

—এলামই তো। বলে রেশমী বারান্দা পেরিয়ে উঠোনে নামলো।

মুকুন্দর ফুলকি বলে মেয়েটা রেশমীকে ভালোবাসে। রেশমীকে দেখেই সে একমুঠো কদমা-বাতাসা নিয়ে এগিয়ে এলো। মিষ্টিগুলো রেশমীর হাতে গুঁজে দিয়ে বললে, তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে রেশমী দিদি ?

—ঘরে।

—তুমি আর আমাদের ঘরে যাও না কেন ?

—তুইও তো আসিস নে।

—কি করে আসবো বলো। আমি নাকি হঠাৎ খুব ডাগরডোগর হয়ে গিয়েছি। আমার নাকি যখন তখন বাড়ির বাইরে যাওয়া ঠিক নয়। ঠাকুরমা আমায় দিনরাত চোখের সামনে রাখে।

—এই ফুলকি, এদিকে আয়। মুকুন্দ বললে, কি করছিস ওখানে ?

—দেখতেই তো পাচ্ছো, কি করছি। রেশমীদির সঙ্গে গল্প করছি।

—ও আবার তোর দিদি হলো কবে ? মুকুন্দর বৌ বাতাসী খামোকা বলে উঠলো, যত্তো সব ঢ্যামনা।

ফুলকির মুখটা কালো হয়ে গেল। রেশমী তার পাশে দাঁড়ানো একটা বাচ্চা ছেলের হাতে কদমা-বাতাসাগুলো গুঁজে দিয়ে দুপদাপ পা ফেলে ঘরে চলে এলো। মনের মধ্যে অস্বস্তি নিয়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়। আঙুলটা তার টাটাচ্ছে। বাইরের বারান্দায় সোনামাসির সঙ্গে কথা বলছে মা। তাদের টুকরো কথা কানে আসছে।

বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে রেশমী। একসময় ঘুম-ঘুম তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

মায়ের ডাকে তন্দ্রা টুটে যায়।—কিরে খুকি, খাবি না ?

—খেতে ইচ্ছে নেই।

ইচ্ছে নেই বলেও উঠলো রেশমী। জানে, সে না খেলে মা খাবে না।

মায়ের সঙ্গে খেতে বসলো রেশমী। লীলা এটা-ওটা কথা বলতে আরম্ভ করে।

রেশমী বুঝতে পারে এটা-ওটা কথা বলাটা একটা ভূমিকা, আসল কথাটা মা ওর বলতে পারছে না।

লীলা একসময় আসল কথাটা বললে, পল্টনের মনটা খুব খারাপ না। সোনা দিদি বলছিল—

রেশমীর চোখে চোখ পড়ে লীলার। কথা তার শেষ হয় না। মায়ের চোখে চোখ রেখেই উঠে পড়ে রেশমী।

সারারাত প্রায় জেগেই কাটালো রেশমী। যতবার ঘুম জড়িয়ে এসেছে, ততবার ঘুম ভেঙে গেছে আঙুলের টাটানিতে।

রাতশেষে কানে এলো নামগান।

কোনোদিন এমন মন দিয়ে নামগান শোনে না রেশমী। আজ শুনলো। ভালো লাগলো। সুরের মধ্যে জাদু জড়ানো আছে। শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে রেশমী। কিন্তু সে ঘুম ভেঙে গেল অসহ্য যন্ত্রণায়। আঙুলটা ফুলে চাঁপাকলার মতো হয়েছে। বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে দেখলো ডান হাতের আঙুল—কেমন যেন গরম, তারপর দপদপানিটাও বোঝা যায়। টিপলো আলতোভাবে। প্রচণ্ড ব্যথা।

লীলা ভয় পেয়ে যায় আঙুলটা দেখে। বলে, কি হয়েছে আঙুলে ?

—চিংড়ি মাছের হুমো ফুটেছে।

—কাল তো বলিসনি। লীলা বলে, এখনো ওই আঙুল নিয়ে চুপ করে আছিস ! বিষিয়ে উঠলে কেলেঙ্কারী।

—কিছু হবে না মা। রেশমীর মুখ ফসকে হঠাৎই বেরিয়ে গেল না হয় আঙুলটা পচবে—মরে যাবো, এই তো।

—ছিঃ, সাতসকালে যত অলক্ষুণে কথা। লীলার মুখটা ভার হয়ে ওঠে। বলে, তোর আজকাল কী হয়েছে বল তো। আগে তো এমন ব্যাদড়া ছিলি নে।

—তুমিই বলো না মা, আমার কি হয়েছে। রেশমী বিছানায় উপুড় হয়ে শোয়। বলে, মা—আমি তো তোমারই মেয়ে।

লীলার মুখের রঙ বদল হয়। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। রেশমী খলখলিয়ে হেসে উঠে বিছানায় গড়াগড়ি যায়।

লীলা থমথমে মুখে উঠে যায়। রেশমী একলা ঘরে আরো একবার

হেসে ওঠে। সে জানে, মা এখন রান্নাঘরে দু হাঁটুতে চিবুক মেরে কাঁদতে বসেছে।

রেশমী এবারে উঠে বসে। মাথার দিককার জানালাটা খুলে দেয়। চুপচাপ বসে থাকে বাইরে চোখ রেখে। বাইরে আগাছার জঙ্গল। তারপরই পথ, একটু তফাতেই পুকুর। সবুজ গাছপালা, আকাশ। রেশমী অন্যমনস্ক হয়। আর সেই অন্যমনস্কতার মধ্যে বাবলুর কথা মনে পড়ে, কতদিন দেখেনি সে বাবলুকে।

একটা ছোট্ট স্বপ্ন উঁকি দিয়ে যায়। একদিন সত্যিই হয় তো স্বপ্নের রাজপুত্রের মতো বাবলু এসে দাঁড়াবে তাব অটো রিকশা নিয়ে।

।। চার ।।

গুমটি মাঠে এখন গভীর রাত।

হঠাৎ রাতের নীরবতা ভেঙে গেল পুরুষকণ্ঠের চিৎকার আর নারীকণ্ঠের আর্ত কান্নায়। সেই সঙ্গে কচি শিশুর কান্না মিশে আছে।

এ-ঘর সে-ঘরের দরজা খুলে গেল। কিছু মেয়ে পুরুষ ছুটে গেল চিৎকার আর কান্না শুনে।

পিরু দাস বৌকে বেধড়ক ঠেঙিয়েছে। যৌবনবতী বৌ সতী আছাড়ি-পিছাড়ি করছে বারান্দার নিচে। পিরু দাস এখনো রাগে টগবগ করে ফুটছে।

লোকজন ছুটে আসতে পিরু দাসের চিৎকার থেমেছে। কিন্তু ফোঁসফোসানি কমেনি। সতী কাঁদছে গলা ছেড়ে। শাড়িটা শুধু কোমরে জড়ানো। তিন আর পাঁচ বছরের দুটি পিঠোপিঠি ছেলেমেয়ে, তারা গলা ফাটিয়ে কাঁদছে।

কি হয়েছে, কি বৃত্তান্ত কিছু জিজ্ঞাসা করতে হলো না। রাগের মাথায় পিরু দাস বলে ফেললো মোদ্দা কথাটা। বৌ-এর পেটে বাচ্চা

এসেছে, এই নিয়ে যত কাণ্ড। বাচ্চা তো হবার কথা নয়, গত বছর হাসপাতালে গিয়ে 'অপারেশন' হয়ে এসেছিল পিরু। সে চেয়েছিল অভাবের সংসারে আর যেন বাচ্চা না আসে। কিন্তু কথাটা সে কাউকে বলে নি। বৌকেও না। কিন্তু আজ যখন বুঝতে পেরেছে বৌ-এর পেটে বাচ্চা এসেছে, তখনই তার মাথায় রক্ত উঠে যায়।

যারা জড়ো হয়েছিল, তাদের বেশির ভাগই চলে গেল লজ্জার কথা শুনে। এই কেচ্ছা শুনতে যাদের রসালো লাগে শুধু তারাই দাঁড়িয়ে আছে।

সতী কাজ করে চিংড়ি মাছের আড়তে। বছরখানেক করছে। কাশীরাম তরফদারের আড়তে ওর কাজ। তরফদার মশায়ের ছোট শালা সতীকে নেকনজরে দেখতো। আর সতীরও ভালো লেগেছিল মানুষটাকে। ফষ্টিনষ্টিতে তারও সায় ছিল। যেখানে ঘরের মানুষের গাঁজা-টানা চিমসে শরীর, সেখানে একটা তরতাজা শরীর হাতের মুঠোয়—সতী নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি। তা ছাড়া মাছের আড়তে প্রায় সবারই ওই একই হালচাল। সবাই প্রায় একই খেলা খেলছে।

বৌ-এর টাকায় এক বছরে ঘরের দেয়াল পাকা করেছে পিরু। খড়ের চাল ফেলে টালি দিয়েছে। টাকা নেবার সময় পিরু একবারও জিগেস করেনি, এত টাকা সে কোথায় পায়।

পিরু একটু শান্ত হয়ে এসেছে। সতীর কান্নাও থেমেছে : শাড়ি গোছগাছ করে উঠে বসতে গেল। কিন্তু পারলো না। বসতে গিয়ে তলপেট চেপে ধরে মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ে কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করতে লাগলো।

বৈরাগী বৌ এত সময় তার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখছিল। আচমকা তলপেট চেপে সতীকে ছটফট করতে দেখে ছুটে এলো। তার মনে একটা সন্দেহ উঁকি দেয়, পেটের বাচ্চাটার কিছু হলো না তো। এই কথা ভাবতে যতটুকু সময়, সতী একবার

রক্তবমি করলো। সতীর মাথাটা কোলে তুলে নিলে বৈরাগী বৌ। শিউরে উঠলো সে। সতীর কাপড়চোপড় রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

—পিরু ঠাকুরপো, বৈরাগী বৌ বললে, একটা রিকশা ডাকো। দাঁড়িয়ে দেখছো কি?

ছোটলাল কাছেই থাকে। ডাকতেই চলে এলো। পাছে এই রাতে আবার হাসপাতালে যেতে হয়, তাই যে যার সটকে পড়লো।

—ও মাগী মরুক। পিরু দাস বলে উঠলো, ও যেন জ্যান্ত ফিরে না আসে। ওর লাশও আমি নিতে যাবো না।

—ছিঃ, ছিঃ বৈরাগী বৌ বললে, আমরা সবাই পাপ নিয়ে ঘর করি। তোমার শরীরে পাপ নেই! তুমি আবার গলাবাজী করছো। পুরুষ মানুষ, বৌকে রোজগার করতে পাঠাও, লজ্জা করে না তোমার। না যাবে—না যাবে, এখন একটু রিকশায় তুলে দিয়ে উপকার করবে?

—পারবো না। পিরু বললে, ও মরুক।

রেশমী আড়ালে ছিল, এগিয়ে এলো। বললে, তোমার সঙ্গে আমিও যাবো কাকিমা।

বৈরাগী বৌ আর রেশমী ধরাধরি করে সতীকে রিকশায় তুললো। সতীর বাচ্চা দুটি 'মাগো' বলে ডুকরে কেঁদে উঠলো।

ছোটলাল আস্তে আস্তে রিকশা নিয়ে চললো।

ঘটনা যাই ঘটুক, গুমটি মাঠের রাত শেষ হলো হারু বৈরাগীর নামগানের সুরে।

কাক-ডাকা ভোরে পিরু এসেছে নিম্বেশ্বরতলায়। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলো কেউ আছে কিনা, তারপর বেদীর ওপর মাথা ঠেকালো। মনে মনে বললে, বাবা নিম্বেশ্বর, সতীরে তুমি ভালো করে দ্যাও, ও বাড়ি ফিরলে আমি তোমার পুজো দেবো।

এই সময় ছোটলালের রিকশা এসে দাঁড়ালো। হারুর বৌ

আর রেশমী এলো। পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় পিরু। চুপিস্বরে জানতে চায়, সে কেমন আছে বৈরাগী বৌদি?

—হয়তো বেঁচে যাবে। বৈরাগী বৌ আর দাঁড়াতে চাইছে না, তার কাপড়চোপড় রক্ত-মাখামাখি। রেশমীর শাড়িরও একই হাল।

ঘরে গেল রেশমী। সাবান-ছোবড়া নিয়ে এলো। বললে, চলো কাকিমা, চান করে আসি।

বৈরাগী বৌ আর রেশমী চলে গেল পুকুরঘাটে। পিরু ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো নিম্বেশ্বরতলায়।

দিন সাতেক বাদে সতী ফিরে এলো। পেটের বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে গেছে।

সতীর অঙ্গ জুড়ে কদিন আগেও ছিল যৌবনের জলতরঙ্গ। এই সাত দিনে সে শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। পিরুই গিয়েছিল বৌকে আনতে। সতী কিছুতেই আসবে না—জিদ ধরেছিল। পিরুই তাকে বুঝিয়েছিল বৈরাগী বৌ-এর কথা দিয়ে, আমরা সবাই পাপ নিয়ে ঘর করি।

সতী কিছুটা অবাক হয়েছিল। পিরু কখনো এত সুন্দর করে শান্ত মেজাজে কথা বলেনি তার সঙ্গে।

রিকশায় ওঠার আগে সতী বলেছিল, তুমি তো বলছো, কিন্তু আর লোকে কি বলবে?

—কি আবার বলবে। পিরু বলেছিল, গুমটি মাঠে কোন ঘরে কালির ছাপছোপ নেই বলতে পারো। এক বলতে পারো ওই বৈরাগীরা—ওদের নে কেউ কোনো কথা বলতে পারে না।

চলতি রিকশায় পিরু বলেছিল, আমার চোখ খুলে গেছে সতী। আমি নিজেকে বদলে ফেলেছি। নেশাভাঙ আর করি নে। সংসারে অভাব তো আমার জন্যে। নয়তো যা রোজগার করি, সংসার চলে

যাবে। তোমারে আর কাজ করতে হবে না।

সতী অবাক চোখে তাকিয়েছিল স্বামীর মুখের দিকে। কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু বলতে পারেনি। রিকশা তখন গুমটি মাঠে এসে পৌঁছেচে।

পিরুই হাত ধরে রিকশা থেকে নামালো সতীকে। এ-ঘর, সে-ঘরের দরজা-জানালায় তখন অনেক কৌতূহলী চোখ উঁকিঝুঁকি মারছে।

বাচ্চা দুটি ছুটে এলো মাকে দেখে। হাত বাড়িয়ে ছোটটাকে কোলে তুলে নেবে সে সামর্থ্য নেই সতীর। রিকশা থেকে নেমেই হাঁপাচ্ছে। শরীরটা হয়ে গেছে বরফচাপা পাঙাশ ট্যাংরার মতো। অথচ কদিন আগে ওই শরীর কচি লাউডগার মতো ডগমগ করতো। পেটে বাচ্চা আসাতে শরীরটা তার আরো পুষ্ট হয়েছিল।

সতীকে হাত ধরে ঘরের দিকে নিয়ে চললো পিরু।

দেখেই বৈরাগী বৌ ছুটে এলো। বৈরাগী বৌই সতীকে শুইয়ে দিলে তক্তাপোশে। ছোট ছেলেমেয়ে দুটি কেমন যেন অবাক চোখে চেয়ে রইলো মায়ের মুখের দিকে।

বেলা এগারোটা।

কাজে যাবার মুখেই পিয়ন এলো রেশমীর ঘরের দরজায়। চিঠি আছে। এই প্রথম চিঠি এলো রেশমীর। এর আগে কেউ কখনো তাকে চিঠি লেখেনি।

চিঠিটা খুললো রেশমী। নিচে নামটা দেখলো। বাবলু।

—কার চিঠি রে? মা ঘর থেকে সবই দেখেছে।

—আমার।

—তা তো বুঝলাম। লিখেছে কে?

—বাবলু।

—কি লিখেছে?

মায়ের কথার উত্তর দিলে না রেশমী, চিঠিটা হাতে নিয়ে খিড়কির পথ ধরে ছুটে গেল পুকুরপাড়ে জোড়া তালগাছের কাছে। যেখানে বাবলু তাকে গল্প শোনাতো।

চিঠিটা বার বার পড়লো রেশমী। কত সুন্দর-সুন্দর কথা লিখেছে। বাবলু শুধু মিষ্টি করে কথা বলতে পারে না, লিখতেও পারে। চিঠিটা বার বার পড়ে ভাঁজ করে ব্লাউজের মধ্যে বুকের কাছে রাখলো রেশমী। একটা চিঠিই আজ তার বুকটাকে ভরিয়ে দিয়েছে।

এমন দিন রেশমীর জীবনে কখনো আসেনি। এর পর হয়তো আরো চিঠি আসবে, কিন্তু প্রথম চিঠি তো আর আসবে না।

বাবলু লিখেছে, শিগগির সে দু-চার দিনের জন্যে এখানে আসবে। কিন্তু কবে আসবে সে? যখন আসবে তখন যদি বাড়ি না থাকে রেশমী।

রেশমীর হঠাৎ আনন্দ কর্পূরের মতো উবে গেল। বাবলু যদি এসে সেদিনের ঘটনার কথা জানতে পারে। সে-ও যদি জানতে চায়, এমন রেশম-রেশম চুল, কটাশে চোখ, কাঁচা হলুদের মতো গায়ের রঙ কোথায় পেলে রেশমী? যদি জানতে চায় তোমার বাবা কেন রেললাইনে গলা দিয়ে আত্মহত্যা করলো?

রেশমীর মনের মধ্যে একটা যন্ত্রণা পাক দিয়ে উঠলো। আস্তে আস্তে উঠে পড়লো পুকুরপাড় থেকে।

বাড়িতে ঢোকার মুখেই রেশমী দেখলো, পল্টনের সাইকেল তাদেরই ঘরের বাইরে দাঁড় করানো।

বারান্দায় এলো রেশমী। জানালা দিয়ে দেখলো, তক্তাপোশে তার মায়ের মুখোমুখি বসে কথা বলছে পল্টন।

বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে রেশমী। পল্টনকে ঘরের মধ্যে দেখে কিছুটা অবাক হয়েছে। এর আগে কখনো পল্টনের পা পড়েনি তাদের ঘরে।

পল্টন বেরিয়ে আসে। রেশমীর মুখোমুখি হয়েই বলে, কিগো সুন্দরী কন্যা, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন ?

রেশমী বলে, তোমরা কথা বলছিলে তাই।

পল্টন আচমকা রেশমীর থুতনি স্পর্শ করে বলে, তাই নাকি।

রেশমীর মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে। পল্টনের দিকে তাকায়।

পল্টন বলে, রাগ করলে তোমাকে আরো সুন্দর দেখায়।

রেশমী আর দাঁড়ায় না। পাশ কাটিয়ে দুপদাপ পা ফেলে ঘরে যায়। চোখ পড়ে তার তক্তাপোশের ওপর। মিষ্টির প্যাকেট পড়ে রয়েছে।

মেয়ের মুখের দিকে একটু ভয়ে ভয়ে তাকায় লীলা। বলে, পল্টন ওর মাসিকে নিয়ে পুরানো বাজারের কালীবাড়ি গিয়েছিল, তাই মিষ্টি প্রসাদ দিয়ে গেল।

রেশমী কোনো কথা না বলে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো।

লীলা মেয়েকে শুনিয়ে বললে, পল্টনের মনটা ভালো রে। শুনলাম ওরা নাকি এখানকার বাস তুলে দিয়ে টাউন বাজারে চলে যাচ্ছে। ছোট একটা বাড়ি কিনেছে পল্টন—মিলনী বায়স্কোপের কাছে।

—ওর সোনামাসির কত গয়না আছে জানিস ?

রেশমী ফিরে দাঁড়ায়। বলে, মা, তোমার আজকাল কি হয়েছে বলো তো ? তুমি তো এমন ছিলে না !

লীলা কিছু সময় চুপ করে বসে থাকে। তারপর বেশ জোরের সঙ্গে বলে ওঠে, আমার ইচ্ছে পল্টনের সঙ্গে তোর বিয়ে হোক।

—শেষটা তুমিও। রেশমী রাগলে চোখ মুখের চেহারাই বদলে যায়। বিশেষ করে চোখ দুটি তার ঝলসে ওঠে। বলে, মা—এখন আমি ভাবছি, তুমি আমার মা কিনা।

খুকি ! লীলা চাপা চিৎকার করে ওঠে।

—আমি খুকি নই। রেশমী ফরফরিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

খানিক সময় বসে রইলো নিম্বেশ্বরতলায় বাঁধানো বেদির ওপর। তারপর হারু বৈরাগীর ঘর থেকে হারমোনিয়ামের সুর ভেসে আসতে উঠে সেই দিকেই গেল।

মাঠকোঠার মধ্যে এই একটি সংসার, যেখানে অভাব থাক, যাই থাক—হাসি আছে, গান আছে, প্রাণ আছে।

হারু বৈরাগী তখন গান শেখাচ্ছে তার সাত বছরের মেয়ে পিয়ালীকে। রেশমীকে দরজার কাছে দাঁড়াতে দেখে ডাকলো, আয়, ভিতরে এসে বোস।

বৈরাগী বৌ ঘরের এককোণে বসে পান সাজছিল। বললে, কি রে—আজ বেরোসনি?

—না। রেশমী বললে, আমায় একটা পান দেবে কাকিমা?

—দেবে কি? বল, দাও। সাজা পান এগিয়ে দিয়ে বৈরাগী বৌ বললে, মাঝে মাঝে এলেই তো পারিস।

পান মুখে দিয়ে রেশমী বসলো হারু বৈরাগীর সামনে। বললে, আমায় গান শেখাবে বৈরাগী কাকা?

—শিখলেই তো পারিস. হারু মনে মনে খুশি হয়েছে রেশমীর কথায়। বললে, গানের চেয়ে বড় কিছু নেই রে। মনের মধ্যে সুর যদি একবার বাসা বাঁধে, দেখবি সে কী আনন্দ। আমি তো আনন্দ নিয়েই বেঁচে আছি রে। নয়তো আর কি আছে বল।

রেশমী অবাক চোখে তাকায় বৈরাগী কাকার মুখের দিকে।

—কি দেখছিস?

—তোমাকে।

—যাক, কবে থেকে আসবি বল?

—কাল থেকেই আসবো।

—তাহলে ভোরে আসিস। নামগান দিয়েই আরম্ভ করবি, কেমন?

রেশমী মাথা নেড়ে সায় দিলে। বৈরাগী মেয়েকে গান শেখাচ্ছে

বসলো। রেশমী ঠায় বসে রইলো। তার চোখ বারবার পড়ছে বৈরাগী কাকার মুখের দিকে।

হারু বৈরাগীর ঘরের লাগোয়া পিরু দাসের ঘর। রেশমী বৈরাগী কাকার ঘর থেকে বেরিয়ে দেখলো, সতী বারান্দার কোণে দেয়াল ঠেস দিয়ে বসে আছে।

কদিন পর আজ নিজে থেকেই উঠে ঘরের বাইরে এসেছে। শরীরের ফ্যাকাশে ভাবটাও কমেছে। তবে এখনো সুস্থ নয়।

সতী বসতে বললে রেশমীকে। কিন্তু বসলো না রেশমী। দু-চার কথা বলে চলে এলো বাড়ি। দেখলো, মা সেই একভাবে বসে রয়েছে তক্তাপোশের ওপর।

মাকে দেখলো এই পর্যন্ত, একটি কথাও বললে না রেশমী। আধবোনা চটের আসনটা নিয়ে এসে বসলো বারান্দায়।

আসন বুনতে বুনতে একসময় বারান্দার কোণেই শুয়ে পড়লো রেশমী। ঘুমিয়েও পড়লো এলোমেলো পাগলা বাতাসের ছোঁয়ায়।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলো, অটো রিকশা নিয়ে এসেছে বাবলু। গুমটি মাঠের মানুষ ভিড় করেছে অটো রিকশা ঘিরে।

রেশমী বসলো অটো রিকশায়। বাবলু ছুটিয়ে দিলে অটো রিকশা। অটো রিকশা ছুটে চললো ঝড়ের মতো। রেশমী ভয় পায়, বার বার বলে, বাবলু—আস্তে ছোটাও তোমার গাড়ি। আমার ভয় করছে।

কিন্তু বাবলুর গাড়ি আরো দ্রুত ছুটতে আরম্ভ করে। স্বপ্নের মধ্যে রেশমীর শরীরটা কেমন হালকা হয়ে যায়।

ঠিক সেই মুহূর্তে মায়ের ডাক।—এই খুকি, ওঠ। সন্ধ্যে হয়ে গেছে।

ঘুম ভেঙে যায় রেশমীর। সেই সঙ্গে স্বপ্নও। ঘরে এসে আবার শুয়ে পড়লো রেশমী। আবার ঘুমের মধ্যে হারিয়ে গেল। কিন্তু স্বপ্নটা আর ফিরে এলো না।

রাতে লীলা ডাকলো রেশমীকে। রেশমী সাড়া দিলে। কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠলো না।

রাত শেষের মুহূর্তে ঘুম ভেঙে গেল রেশমীর। খোল-করতাল বেজে উঠেছে হারু বৈরাগীর ঘরে। নামগান আরম্ভ হবে।

রেশমী উঠে পড়লো বিছানা ছেড়ে। কলসি থেকে এক ঘটি জল গড়িয়ে চোখে-মুখে দিলে। তারপর দরজা খুলে বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়ালো।

—কোথায় যাচ্ছিস? লীলা জিজ্ঞাসা করলো।

—বৈরাগী কাকার ঘরে। গান শিখবো।

—ঢঙ দেখে আর বাঁচিনে।

রেশমী মায়ের কথা গায়ে মাখলো না। বেরিয়ে গেল আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে।

গুমটি মাঠে এখন নতুন কথা, বেশমী গান শিখছে।

॥ পাঁচ ॥

এদিকটা এখনো বিজলী বাতির লাইন আসেনি। কিন্তু বাইরে মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টে আলো জ্বলে। সে আলো এদিকের পরিবেশকে আলোকিত না করলেও অন্ধকারটাকে ফিকে করে দেয়।

ল্যাম্পপোস্টের নিচে খানিকটা জায়গায় ইট বিছানো। পল্টনের শাগরেদরা সন্ধ্যের পর মাঝে মাঝে এখানে তাস খেলে, আড্ডা দেয়। তবে কাজ থাকলে এখানে ওদের দেখা যায় না। ছিনতাই, মস্তানী, রঙবাজী, ওয়াগন ভাঙা, সিনেমা টিকিটের কালোবাজারী এই তো ওদের কাজ। এছাড়া আছে ধাঙড় পাড়ায় চোলাই মদের গোপন কারবার। পল্টন হলো নাটের গুরু, সে থাকে ধরাছোঁয়ার বাইরে।

আজ সন্ধ্যের আগে থেকেই ল্যাম্পপোস্টের নিচে তাসের আড্ডা

জমেছে। খেলছে চারজন। তাদের ঘিরে আরো জন পাঁচেক।

কাজ সেরে রেশমী ফিরছিল পায়ে হেঁটে। একা।

তাসের আড্ডার পাশ কাটিয়ে সে চলে যাচ্ছিল। ওরই মধ্যে একজন ফোড়ন কেটে বলে ওঠে, উঁ—কী আঁশটে গন্ধ শালা।

সঙ্গে সঙ্গে একটি ছেলে 'ওয়াক-ওয়াক' করে উঠলো।

আরো কথা কানে এলো, যাই বলিস প্যালা—খাসা মাল মাইরি। বডিটা দেখেছিস?

—দেখে আর কি করবো। প্যালা বললে, শালা—ও তো আমাদের ওস্তাদের হিরোইন।

রেশমী দ্রুত পা চালিয়ে চলে এলো। কিন্তু বাড়ির বারান্দায় পা দিয়েই দেখলো দরজায় তালাবন্ধ। রেশমী ভাবলো, মা নিশ্চয়ই সোনামাসির ঘরে গল্প ফেঁদে বসেছে।

একবার ভাবলো রেশমী, বৈরাগী কাকিমার কাছে যায়। কিন্তু গেল না। নিম্বেশ্বরতলার বাঁধানো বেদিতে বসে রইলো চুপচাপ।

মা আসছে পান চিবোতে চিবোতে। রেশমী কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছে, মা যেন বদলে যাচ্ছে। মায়ের চলনে বলনে সোনামাসির হাওয়া। আজ সে অবাক হলো মায়ের পরনের শাড়ি দেখে। তারই ছাপা শাড়ি পরেছে মা। চুল বেঁধেছে বেশ আঁটসাঁট করে। আর এই মুহূর্তে মনে পড়লো বাবার সেদিনের কথা। আজকাল বাবাকে ঠিক বাবা বলেও ভাবে না রেশমী। ভাবে, সেই মানুষটা যে মায়ের সঙ্গে থাকতো, যাকে সে বাবা বলে জানতো।

—ফিরে কখন এলি? মা জানতে চাইলো।

—রোজই যখন আসি। রেশমী যান্ত্রিক ভঙ্গিতে উত্তর দিলে।

তালাবদ্ধ দরজা খুললো মা। রেশমী ব্লাউজের খাঁজ থেকে আঠারোটি টাকা তক্তাপোশের ওপর এক রকম ছুঁড়েই ফেলে দিলে। মা

একবার মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, রাগ দেখাচ্ছিস কার ওপর ?

কথার উত্তর দিলে না রেশমী। সাবানের কৌটো আর গামছা নিয়ে পুকুরঘাটের দিকে চললো।

ঘাটে দেখা হলো বৈরাগী কাকিমার সঙ্গে। কোনোদিন সন্ধ্যে উতরে গেলে ঘাটে আসে না বৈরাগী কাকিমা।

—কাকিমা, তুমি এখন ?

—আর বলিস কেন, সতীর বাচ্চা মেয়েটাকে কোলে নিয়েছিলাম। কাপড়চোপড় এমন নোংরা করে দিলে—

—ওরা এখন ভালো আছে, না ?

—ভালোই আছে। পিরু ঠাকুরপোই কত বদলে গেছে। এখন আর সতী ছাড়া কিছু জানে না। বৈরাগী বৌ রেশমীর সাবানটা নিলে। বললে, বাঃ, তোর সাবানটার খাসা চন্দন-চন্দন গন্ধ তো। তুই তো রোজ টাউনে যাস, আমার জন্যে একটা নিয়ে আসিস তো। যা দাম লাগে দিয়ে দেবো।

—দামের কথাটা না বললেই পারতে কাকিমা। রেশমী বললে, তুমি মুখ ফুটে চাইলে আর আমি তা দিতে পারবো না ?

গা ধুয়ে বৈরাগী কাকিমার সঙ্গেই ফিরলো রেশমী।

বাড়ি এসে দেখলো রেশমী, মা শাড়ি বদলে ফেলেছে। ছাপা শাড়িটা পাট করে রেখেছে বালিশের নিচে।

রেশমী ভিজে শাড়ি ছাড়লো। মাথার চুল খুলে পরিপাটি করে আঁচড়ালো। গায়ে পাউডার মেখে তাক থেকে সেন্টের শিশিটা বার করে দু-চার ফোঁটা শাড়িতে ব্লাউজে লাগালো। সারাদিন চিংড়ি মাছ ঘেঁটে, গা ধোয়ার পরেও মনে হয় আঁশটে গন্ধটা গায়ে জড়িয়ে আছে। পাউডার আর সেন্টে গা-ঘিনঘিন ভাবটা কেটে যায়।

লীলা আড়চোখে দেখছিল মেয়েকে। বললে, কাল থেকে আর মাছের আড়তে যাবি না। পল্টন ও-সব পছন্দ করে না।

—মা! ফিরে দাঁড়ালো রেশমী। রাগলে তার চোখ দুটি যেমন

জ্বলে ওঠে, তেমনি জ্বলে উঠলো। বললে, আমি তোমার খেলার পুতুল নই মা। আমার যা খুশি, আমি তাই করবো। তুমি যদি মনে করে থাকো, আমি পল্টনের গলায় মালা পরাবো, তাহলে স্পষ্ট কথা শুনে রাখো, আমি পল্টনকে বিয়ে করবো না। ওকে আমি ঘেন্না করি। আচ্ছা মা, একটা কথা তুমি আমায় বলবে? তুমি কি চাও না তোমার মেয়ে ভালো থাকুক?

—চাই বলেই তো পল্টনের হাতে তোকে দিতে চাই। আমি ওদের কথা দিয়েছি।

রেশমীর মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠলো। ফেটে পড়লো সে—বলো তো এবার সত্যি কথা, আমার এই রেশম-রেশম চুল, এই চোখ, এই গায়ের রঙ আমি কোথায় পেলাম?

মুহূর্তে বিবর্ণ হয় লীলার মুখ। মাথা নিচু করে। কিছু বলতে চায়, পারে না। শুধু ঠোঁট দুটি থরথর করে কাঁপে।

—মা, আমি জানি বোবা হয়ে থাকা ছাড়া তোমার কোনো উপায় নেই। রেশমী তার মায়ের হাত দুটি ধরে সজোরে ঝাঁকুনি দিলে। বললে, সত্যি বলো তো আমি কে?

লীলার চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়লো। বুকচাপা নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। তারপর আচমকা গা-ঝটকা দিয়ে বলে উঠলো, তুই আমার শত্তুর।

—সে তো বলবেই। বলে দরজার দিকে এগিয়ে যায় রেশমী।

—কোথায় যাচ্ছিস ফরফরিয়ে?

—বৈরাগী কাকিমার কাছে।

দাঁড়ায় না রেশমী। ছুটে চলার ভঙ্গিতে চলে যায় হারু বৈরাগীর ঘরের দিকে।

মনের মধ্যে জ্বালা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে লীলা।

অনেক সময় ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে রইলো লীলা। তারপর

একসময় খোলা দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। চোখ পড়লো নিম্বেশ্বরতলার দিকে। কে যেন দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারের মধ্যে। লীলার বুকটা কেঁপে উঠলো। কেমন একটা ভয় ভয় ভাব লীলাকে আড়ষ্ট করে তুললো।

কেউ টর্চ জ্বেলে এদিকেই আসছে। হঠাৎ আলোয় একটা স্পষ্ট অবয়ব ফুটে উঠলো। কিন্তু পলকের মধ্যেই হারিয়ে গেল আলোর বিপরীতে।

টর্চের আলোটা খিড়কির দিকে গেল। কেউ হয়তো পুকুরঘাটের দিকে যাচ্ছে।

লীলা ভাবলো, হয়তো চোখের ভুল। কিংবা এমনি কেউ দাঁড়িয়ে ছিল। মনকে যাই বোঝাক, তবু ভয়টাকে সরাতে পারলো না।

বারান্দায় দেয়াল ঠেস দিয়ে বসে রইলো লীলা। রেশমীর অপেক্ষায়।

রেশমী এলো বেশ রাত করে। কথা নেই, বার্তা নেই, সোজা ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়লো তক্তাপোশে।

লীলাও ঘরে এলো। জিজ্ঞাসা করলো, শুয়ে পড়লি যে, খাবি না?

—না। বৈরাগী কাকিমা না খাইয়ে ছাড়লো না। তুমি খেয়ে নাও।

লীলা বললে, তুই আমায় কত যন্ত্রণা দিবি বল তো?

রেশমী ঠোঁটকাটা মেয়ে। মনরাখা কথা কোনোদিনই সে বলতে পারে না। সাফ বলে দিলে, যন্ত্রণার এখন হয়েছে কি তোমার? যন্ত্রণাই তো তোমার পাওনা। তোমার উচিত ছিল, জন্মের সময় আমায় গলা টিপে শেষ করে দেয়া। বাঁচিয়ে রাখলে কেন বলো তো?

—খুকি। লীলা ফুঁসে উঠলো।

—মা, তুমি তোমার মতো বাঁচো, আমাকে আমার মতো বাঁচতে দাও।

লীলা আর কোনো কথা বললে না। রেশমীও বালিশে চিবুক রেখে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো। সহজে কান্না আসে না তার, কিন্তু আজ এই মুহূর্তে বোবা কান্না ওকে উতলা করে তুললো।

মাথার দিককার জানালা বন্ধ ছিল। খুলে দিলে।

ভাঙা চাঁদ এখনো আকাশের কোণে জ্বলছে। নিভে যাওয়ার সময় হলো।

নামগান আরম্ভ হবার আগেই চোখে মুখে জল দিয়ে রেশমী চলে যায় হারু বৈরাগীর ঘরে। কিন্তু আজ খোল-করতাল বাজলো, নামগান আরম্ভ হলো—রেশমী গেল না। এই তো কদিন হয়েছে, এরই মধ্যে রেশমী নিজেকে সুরের সঙ্গে মেশাতে পেরেছে। বৈরাগী কাকা বলেছে, তোর গলা ভালো রেশমী, মনের মধ্যে সুর বাসা বেঁধে আছে—তুই ভালোই গাইতে পারবি।

রেশমী নিজে মাঝে মাঝে ভাবে, সে নিজে তো জানতো না, এত সুর তার মনের গভীরে ছিল।

বৈরাগী কাকাকে আগে এতটা বুঝতো না রেশমী। এখানে আরো মানুষের মতো সে বৈরাগী কাকাকে 'শ্মশান কীর্তন' বলে জানতো। জানতো মানুষটা ভালো। কিন্তু এখন দেখছে মানুষটা শুধু ভালো নয়—বড় মনের মানুষ।

যেমন বৈরাগী কাকা, তেমনি কাকিমা। তিনটি মেয়েও বাবা-মায়ের মতো স্বভাব পেয়েছে। ললিতা, বিশাখা, পিয়ালী তিন বোনই রেশমী দিদি বলতে অজ্ঞান।

রেশমী আজ গেল না নামগানের আসরে। চুপচাপ শুয়ে রইলো বালিশে মুখ গুঁজে।

বিশাখা এলো। খোলা জানালায় উঁকি দিয়ে ডাকলো,

রেশমী দিদি।

রেশমী উঠে বসলো। বললে, আয় বিশাখা।

বিশাখা ঘরে এলো। বললে, আজ এলে না কেন রেশমী দিদি?

রেশমী বললে, রোজই তো যাই, একদিন না হয় যাইনি।

কিশোরী বিশাখা, কি বুঝলো সেই জানে। রেশমীর মুখের দিকে খানিক সময় চেয়ে থেকে বললে, তোমার মন ভালো নেই, না রেশমী দিদি?

রেশমী অবাক হয় বিশাখার কথা শুনে।

বিশাখা কাছে আসে। যদিও ঘরে আর কেউ নেই, তবু চুপি স্বরে বলে, রেশমী দিদি, তোমার খুব কষ্ট, না?

—ওরে দুষ্টু, তুই এত কথা জানলি কি করে। বিশাখাকে দুহাতে বুকের মধ্যে টেনে নেয় রেশমী। বলে, নারে, আমার কোনো কষ্ট নেই।

লীলা ইতিমধ্যে একবার দরজার কাছে দেখা দিয়ে চলে যায়।

বেলা এগারোটা নাগাদ রেশমী কাজে বেরিয়ে যায়। নাটুর বৌ-এর জ্বর হয়েছে। কদিন যাচ্ছে না। রেশমী তাই একাই যায়। যেদিন ছোটলাল সামনে পড়ে, সেদিন সেই তাকে টাউন বাজার অব্দি নিয়ে যায়। ভাড়াটাড়া নেয় না। ভাড়ার কথা বললে বলবে—দিদির কাছে ভাই ভাড়া নেয় নাকি?

আজ বেরোবার মুখে ছোটলালকে পেয়ে গেল রেশমী। ছোট-লালের রিকশা চেপে রেশমী চললো টাউন বাজারের দিকে।

টাউন বাজারের মুখে রেশমী চলতি রিকশা থেকে দেখতে পেল বাবলুর মাকে। বাস থেকে নেমে দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে জিনিসপত্তর। কিন্তু বাবলুকে দেখতে পেল না।

রিকশা থেকে নামলো রেশমী। নিঃশব্দে এগিয়ে যায় বাবলুর মায়ের কাছে।—ভালো আছো মাসিমা, বলে প্রণাম করে।

—ও মা, তুই কোথায় ছিলি ?

—এদিকে যাচ্ছিলাম।

কথার মধ্যে বাবলু এসে যায়। বাস থেকে নেমে সে মিষ্টি কিনতে গিয়েছিল। রেশমীকে দেখে অবাক হয়। বলে, তুমি এখানে ?

রেশমী তখন দেখছে বাবলুকে। ক'মাসে বাবলু অনেক বদলে গেছে। চেহারাটা আরো সুন্দর হয়েছে। রঙও আগের চেয়ে ফর্সা দেখাচ্ছে।

—বাড়ি যাবে তো ? বাবলু বললে, চলো একসঙ্গেই যাই।

রিকশা ডাকতে হলো না। ছোটলাল কাছেই ছিল।

বাবলু বললে, আর একটা রিকশা ডাক ছোটলাল।

বাবলুর মা বললে, নারে, একটাতেই হয়ে যাবে। রেশমী আমার কোলে বসবে।

—পারবে না মা। বাবলু মৃদু হেসে তাকায় রেশমীর দিকে। বলে, গতরটা দেখছো না।

—তোর মুখে যত বাজে কথা। বাবলুর মা বলে, ছ্যাখ মায়ের কোল শক্ত হয়। দুটো রিকশায় উঠলো ওরা। একটাতে বাবলু একা। রেশমী হঠাৎই অন্যমনস্ক হয়। ভাবছে, গুমটি মাঠে গেলেই সব জানাজানি হয়ে যাবে। বাবা নামে মানুষটার সেদিনের সেই ভয়ঙ্কর কথা থেকে আরম্ভ করে সব কিছু।

—হ্যাঁরে, তোর বাড়ির খবর সব ভালো তো ? বাবলুর মা জিজ্ঞাসা করে।

—বাবা নেই। রেশমী না বলে পারলো না কথাটা। বাবা রেলে গলা দিয়ে আত্মহত্যা করেছে, সে কথাও গোপন করলো না।

বাবলুর মা অবাক হলো শুনে। বললে, কেন, কি হয়েছিল ?

—তুমি আর কিছু জানতে চেয়ো না মাসিমা। চলতি রিকশায় বাবলুর মায়ের মুখের দিকে তাকালো রেশমী। বললে, মাসিমা—

আমার কি হবে বলো তো?

বাবলুর নরম মনের মানুষ। একটুতেই তার কান্না এসে গেল। কিন্তু রেশমীর চোখে এতটুকু জল নেই। সে এখন ভাবছে অন্য কথা।

রিকশা এসে দাঁড়ালো গুমটি মাঠে। ওদিক-ওদিক থেকে অনেক চোখ এসে পড়লো রিকশার ওপর। সবাই দেখলো, বাবলু আর বাবলুর মায়ের সঙ্গে রিকশা থেকে নামছে রেশমী।

বাবলুদের ঘরের পাশেই হারু বৈরাগীর ঘর। বাবলুরা এখানে ছিল না, ঘরের চাবি দেয়া ছিল বৈরাগীর বৌ-এর কাছে।

হারু বাড়ি ছিল না। বৈরাগী বৌ আর ললিতা বেরিয়ে এলো। এদিক-ওদিক আরো এক-আধজন এলো।

লীলা নিম্বেশ্বরতলায় দাঁড়িয়ে ডাকলো রেশমীকে, এই খুকি—এদিকে আয়।

বাবলুর মা তাকালো লীলার দিকে। লীলা নিম্বেরতলায় দাঁড়িয়ে আছে। বাবলুর মা ভাবলো, হয়তো আসতে পারছে না। স্বামী হারানোর ব্যথাটা তো কম নয়।

—কিরে, ডাকছি শুনতে পাচ্ছিস নে? লীলা আবার ডাকলো।

রেশমী মাথা নিচু করে চলে গেল। বৈরাগী বৌ-এর মুখ ফসকে বেরিয়ে এলো, আরো কত দেখবো। মেয়েটার জন্যেই কষ্ট হয়।

বাবলুর মা কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলতে পারলো না। পল্টনের সোনামাসি হেলতে দুলতে এদিকেই আসছে।

বৈরাগীদের রোয়াকে থপ করে বসে পড়লো সোনামাসি। বললে, কিগো বাবলু, ডেরাইবারি শেখা হলো!

—হ্যাঁ ঠাকুমা।

—আবার সেই ঠাকুমা, মাসি কি পিসি বলতে পারিস নে। আমি কি তোর ঠাকুমার বয়সি।

—রাগ করলে ঠাকুমা, রাগ করো না। বাবলু বলে, মাসি পিসি

অনেক আছে, ঠাকুমা নেই।

—মুখপোড়া ছেলে, সোনামাসি বলে, যাক গে এখন বল—কাজকম্ম কিছু করছিস?

—করছি বৈকি। কলকাতা-বজবজ লাইনে কদিন কাজও করলাম। এবার ভাবছি নিজে একটা কিছু করবো।

—তার মানে?

—মানে, পরের চাকরি নয়, নিজে একটা তিন চাকার গাড়ি কিনবো।

—ওই টেম্পো নাকি বলে তাই?

—না, অটো রিকশা, মানে ট্যাক্সির ছোট ভাই।

সোনামাসি একটু অবাক হয়। বলে, টাকা পাবি কোথায়?

—টাকার কি অভাব। ব্যাংক দেবে।

—তা ভালো। সোনামাসি বলে, যাক—তোর ভালো হোক, মাকে একটু সুখে রাখ।

এবারে বাবলুর মাকে কাছে ডাকলো সোনামাসি। নিজে থেকেই অনেক কথা উগরে দিলে! বিষ ঢালার মতো। অনেক কথা লতাপাতায় শোনালো।

সব শোনার পরেও বাবলুর মা বললে, নেশা করলে দাশু তো পাগলের মতো বকতো, ওর কথা কি ধরে রাখার।

বৈরাগী বৌ ঝোপ বুঝে কোপ মারলো। বললে, সোনাদিদি, হিসেবে তুমি ভুল করলে। তুমিই যদি এ সব বিশ্বাস করবে, তাহলে পল্টনের সঙ্গে ওর বিয়ে চাইছো কেন?

সোনামাসির মুখ এতটুকু হয়ে গেল। সত্যি, হিসেবে তার ভুল হয়ে গেছে। তবু নিজের গা বাঁচাতে বললে, ওই নিয়েই তো পল্টনের সঙ্গে আমার দিনরাত খ্যাচাখেচি। আজকালকার ছেলে, ওদের ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা। তা ছাড়া এ-ও ভাবি মেয়েটার বাপ কি বলেছে সেটা তো ধরে রাখতে গেলে চলবে না।

উঠে দাঁড়ালো সোনামাসি।

—চললে কোথায়? বাবলুর মা বললে, বোসো—কদ্দিন পর দেখা হলো।

—না, যাই। পল্টন আবার এ-সব কথা নে কথা বলা পছন্দ করে না। তাছাড়া ছোঁড়া আবার ঘরে রয়েছে। রাতে যাত্রা শুনতে গিছিল, শেষ রাতে বাড়ি ফিরে ভোত-ভোত করে ঘুমোচ্ছে।

সোনামাসি অঙ্গ দোলাতে দোলাতে চলে গেল। বাবলুর মা-ও এখন একটু অন্যমনস্ক।

বৈরাগী বৌ বললে, দিদি, রেশমীকে বাঁচাতে পারো তুমি।

বাবলুর মা বললে, আমি তো বরাবরই তাই চেয়েছি বৌ। কিন্তু লীলা যদি আমার ঘরে মেয়ে না দেয়—মেয়ে তো তার।

কথার মধ্যে বাবলুর মা লক্ষ্য করলো, রেশমীকে নিয়ে লীলা ঘরে ঢুকে সশব্দে বন্ধ করে দিলে দরজা।

॥ ছয় ॥

গুমটি মাঠের চলতি জীবনধারা ঠিকই চলছে।

ছোট ছোট ঘটনা, যে ঘটনা সহজেই উড়িয়ে দেয়া যায়, তা-ও এখানে খবর হয়ে ওঠে। তাই নিয়ে চলে ঘোঁট পাকানো, চলে কানাকানি, অনেক সময় ঘূর্ণিঝড়ও ওঠে।

বাবলুর মায়ের সঙ্গে রেশমী এক রিকশায় এসেছে, এটাও যেমন খবর, তেমনি বাবলু অটো রিকশা কিনবে এ-ও খবর। আরো খবর, একদিন রাত্রে নাকি নিম্বেশ্বরতলায় ভূত দেখা গেছে। দেখেছে বলাই হালদার। তবে চেনা ভূত নয়। এ-ছাড়া আরো জোরদার খবর, রেশমীর সঙ্গে নাকি পল্টনের বিয়ে হবে এবং শিগগিরই। খবরটা মুখরোচক চানাচুরের মতো। মুখে মুখে ফিরছে।

এত'র মধ্যে গুমটি মাঠের জীবনধারা একই খাতে বয়ে চলেছে। একই নিয়মে রাত শেষ হয় নামগানের সুরে। যার মধ্যে মিশে থাকে

রেশমীর সুরেলা কণ্ঠ।

আজও রাতশেষে রেশমী যাচ্ছিল হারু বৈরাগীর ঘরে। তখনো ভোরের আলো ফোটেনি। গা-ঘোর অন্ধকার জড়ানো পরিবেশ। দরজা খুলে বাবান্দায় পা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেশমীর চোখ পড়ে, নিমেশ্বরতলার বেদীর দিকে। কে যেন দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। শুধু তাই নয়, লোকটি ফিরে দাঁড়িয়ে হনহন করে চলে গেল।

রেশমীর মনটা হঠাৎই দুলে উঠলো। কে দাঁড়িয়েছিল ওখানে! মানুষটিকে স্পষ্ট দেখতে না পেলেও, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা একজন দীর্ঘকায় মানুষের অস্পষ্ট চেহারা স্পষ্ট হয়ে ফুটেছিল চোখের সামনে।

রেশমী সাহসী মেয়ে। ভয় কি তা জানে না। তাছাড়াও ও জানে, ভূতেরা শুধু গল্পেই থাকে। তবু রেশমী থমকে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো, কে ওখানে দাঁড়িয়েছিল। আর লোকটি কেনই-বা অতো তাড়াতাড়ি চলে গেল।

খোল-করতাল বেজে উঠলো হারু বৈরাগীর ঘরে। নামগান আরম্ভ হবে। পা বাড়ালো রেশমী। চললো বৈরাগী কাকার ঘরের দিকে। যাওয়ার সময় রেশমী এদিক-ওদিক ফিরে তাকায়। না, কেউ কোথাও নেই।

নামগান শেষ হয়ে যায়। তারপর রেশমীকে নিয়ে বসে হারু বৈরাগী। কোনোদিন বৈরাগী কাকিমা বসে যায়। বৈরাগী কাকিমা নবদ্বীপের কীর্তনীয়ার মেয়ে। আজ বৈরাগী কাকিমাই বসেছে রেশমীকে গান শেখাতে।

রেশমীর আজ প্রথমেই সুরে ভুল হয়ে গেল। কিছুটা অন্যমনস্ক সে। তার অন্যমনস্কতা ধরা পড়লো বৈরাগী কাকিমার চোখে। জিগেস করলো, হ্যাঁরে রেশমী, কিছু হয়েছে তোর?

—না তো।

—মনে হচ্ছে কিছু ভাবছিস। নয়তো যে সুর কাল তুলে দিয়েছি,

সে সুরে এমন ভুল হবে কেন ? সত্যি বল তো, কী ভাবছিস ?

রেশমী মুখে সহজ হাসি ফোটাতে চেষ্টা করলো। বললে, আমার' কোনো ভাবনা-চিন্তা নেই কাকিমা।

—ওইটাই তো ভাবনার কথা।

রেশমী হঠাৎই একটু চঞ্চল হলো। বললে, আজ আমি যাই কাকিমা।

বৈরাগী কাকিমা হাসলো। বললে, ঠিক আছে, আয়।

বাবলুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বৈরাগীর ঘর থেকে বেরোতেই। মুখে দাঁতন কাঠি ঘষতে ঘষতে বাবলু ফাঁকা জায়গায় পায়চারি করছিল দুজনে চোখাচোখি হলো। কিন্তু কেউ এগিয়ে আসতে চাইলো না আগেভাগে। শেষটা রেশমীই গেল বাবলুর কাছে। বললে, দেখা যায় না কেন ?

বাবলু বললে, আমি তো ওই কথাটাই জিগেস করতে চেয়েছিলাম। যাক, শোনো তোমার সঙ্গে কথা আছে। একসময় এসো আমার কাছে।

—বলো না কি বলবে।

—পরে বলবো।

—কি এমন কথা আছে, যা এখন বলতে পারছো না।

—তবে শোনো। বাবলুর কণ্ঠস্বরে রুক্ষতা। বললে, তুমি চিংড়ি মাছের আড়তে কাজ করছো—এ কথা বলোনি তো।

—ও বাব্বাঃ, এই কথা।

—হ্যাঁ, এই কথা। বাবলুর চোখে মুখে ঘৃণার ভাব। বললে, ওটা ছোটলোকের কাজ।

রেশমীর চোখ দুটি দপ করে জ্বলে উঠলো। বললে, লরি ধোয়ার কাজ করতে না তুমি ? তুমি না একদিন কাছারির চায়ের দোকানের এঁটো কাপ ধুতে ?

বাবলুর চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠলো। বললে, যাও—তোমার

সঙ্গে কথা বাড়াতেই চাই না। আমি জানতাম না তোমাকে।

—ব্যস্, এ্যাদ্দিনের ভালোবাসা—ভালোলাগা সব ফুটো বেলুনের মতো চুপসে গেল। রেশমীর মুখে বাঁকা হাসি ফুটলো। বললে, এ আমি জানতাম বাবলু। এ ছাড়া আরো কথা আছে, যা তোমার, তোমার মায়ের কানে গেছে। আর সে কথাটা বলতে চাইছো না। আমি জানি বাবলু, অনেক ঝড় আমায় মাথায় নিয়ে বাঁচতে হবে। যাক, আর কিছু জানতে চাও না?

বাবলু চুপচাপ।

রেশমী লক্ষ্য করলো বাবলুর মা দরজা খুলে এই দিকেই চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে। বাবলু যদিও দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু রেশমী বুঝতে পারে বাবলু এখন তার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চাইছে।

রেশমী তার মনের মধ্যে হঠাৎ একটা চমক অনুভব করলো। চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললে, এবারে তোমাকে একটা কথা জিগেস করবো, কথাটা আমার—আমি উত্তর খুঁজে পাইনি। বলো তো, এমন রেশম-রেশম চুল, এমন কটাশে চোখ, এমন কাঁচা হলুদের মতো গায়ের রঙ আমি কোথায় পেলাম?

বাবলু ছিটকে চলে গেল। উদ্দাম সুরে হেসে উঠলো রেশমী। হাসতে হাসতে চলে এলো নিম্বেশ্বরতলায়। ছায়ার নিচে বাঁধানো বেদীতে বসে পড়লো হাসির রেশ নিয়ে।

চুপচাপ বসে আসে রেশমী। অন্যমনস্ক সে। এখন সে অনেক কিছুই ভাবছে। ভাবনার মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে বাবলু।

ছোটবেলায় খেলার তাস দিয়ে ঘর তৈরী করতো রেশমী। কত যত্নে সে ঘর গড়ে তুলতো। কিছু একটু ফুঁ দিলেই ভেঙে যেতো। গড়তে যত আনন্দ, ভাঙতেও তত। একবার গড়া, একবার ভাঙা—ভাঙাগড়ার খেলাতেই সময় কেটে যেতে।

কিন্তু বাবলুর সঙ্গে তার ভালোবাসার ঘর। হিসেব করে দেখেছে

রেশমী—ন'বছর ধরে তারা দুজনে সুন্দর একটা স্বপ্নের ঘর তৈরী করেছিল। অথচ সে স্বপ্নের ঘরটা আচমকা ভেঙে গেল তাসের ঘরের মতো।

নাটুর বৌ পুকুরঘাটে যাচ্ছে। রেশমীকে নিম্বেশ্বরতলায় বসে থাকতে দেখে দাঁড়ালো। বললে, কিরে এখানে বসে?

রেশমী বললে, এই বসে আছি।

—কাজে যাবি তো?

—যাবো বৈকি। একসঙ্গেই যাবো আজ। তুমি ডাকবে, না আমি ডাকবো?

—তুই-ই ডাকিস।

নটুর বৌ চলে যেতে রেশমীও উঠে পড়লো। ঘরে ঢুকেই দেখলো মা বসে আছে জানালার ধারে।

লীলা বললে, সকালে দোকান-বাজারটা তো করে দিতে পারিস এক-আধদিন।

রেশমী বললে, কথাটা তো সহজ করেই বলতে পারতে মা। বলতে তো পারতে, যা খুকি দোকান থেকে ঘুরে আয়।

লীলা বললে, আমার গর হয়েছে। তাই বলছি, ডাল, নুন আর সরষের তেল নিয়ে আয়।

—যাচ্ছি।

টাকা, থলে নিয়ে হনহন করে হেঁটে যাচ্ছিল রেশমী। কিছুটা অন্যমনস্কও ছিল সে, লক্ষ্য করেনি সামনে একটা গরু আসছে। গরুর পাশ কাটিয়ে যেতেই পল্টনের সাইকেলের সামনে পড়লো রেশমী। সাইকেল ছুটিয়ে আসছিল, ধাক্কা লেগে পড়ে তো গেলই, তাছাড়া চাকায় জড়িয়ে শাড়ির খানিকটা ফড়ফড় করে ছিঁড়ে গেল।

পল্টন সাইকেল থেকে নেমেই তুলে ধরলো রেশমীকে। রেশমী কেমন সিঁটিয়ে গেল। পল্টন তার বগলের কাছে দুটো হাত ধরে রেখেছে।

—তবু ভালো। পল্টন নিচু গলায় বললে, এমনিতে তোকে ধরা যায় না। শাড়িটা ছিঁড়লো তো।

—ছাড়ো।

—যদি না ছাড়ি। এ তো বাবলুর নরম হাত নয়। বলে পল্টন হাতের চাপটা একটু জোরেই দিলে।

—কি হচ্ছে। রেশমী বললে, ছাড়ো—

– ঠিক আছে, এখন তোমায় ছেড়ে দিচ্ছি, তবে একটা কথা জেনে রাখো, আমি তোমায় শেষ পর্যন্ত ছাড়বো না—বুঝেছো?

পল্টনের হাত থেকে মুক্ত হয়ে ছেঁড়া শাড়ি গোছগাছ করে দোকানে গেল রেশমী। দোকানে দেখা হয়ে গেল সোহাগীর সঙ্গে।

—কিরে, তরে না একদিন আমার বাড়ি আসতি বলিছিলাম। সোহাগী বলে, এলিনি তো?

—একদম মনে ছিল না। তুইও তো আসতি পারতিস।

—গুমটির মাঠে যাতি আমার ভয় নাগে।

—কেন?

—ওই পল্টনের জন্যি।

—তোর ওপরেও তার নজর?

—কার ওপর তার নজর নেই বলতি সারিস? কাঁচা বয়সির মেয়েছেলে দেখলিই ওর নোলা ছোঁক ছোঁক করে।

এ সব গা-ঘিনঘিন করা কথা শুনতে ভালো লাগে না রেশমীর। দোকানের জিনিস নিয়ে এখুনি ফিরবে এই কথা জানিয়েই চলে গেল সে। সোহাগী মেয়েটা এমনিতে ভালো। তবে ওই এক ধাঁচের।

দোকানের জিনিসপত্তর নিয়ে বাড়ি এলো রেশমী। মা উনুনে আঁচ দিয়ে ভাতের হাঁড়ি চাপিয়েছে।

থলেটা নামিয়ে ঘরে এলো রেশমী। আরশিটা বিছানার বালিশের গায়ে লাগানো ছিল। হয়তো মা চুল আঁচড়ে এখানেই রেখে গেছে।

আরশিতে চোখ পড়লো রেশমীর। মুখ দেখতে অন্যমনস্ক হলো। এই চোখ, এই মুখ, এই রঙ—এ তো তার পাওনা বলেই পেয়েছে।

পেছনে এসে দাঁড়ালো লীলা। কী যে হলো তার, এসেই মেয়ের চুলের ঝুঁটি ধরে বললে, দিন-দুপুরে ঢলানি করবি তুই, আর লোকের কাছে কথা শুনবো আমি। সে শত্তুর মরেছে রেলে গলা দিয়ে, আমি মরবো গলায় দড়ি দিয়ে।

রেশমী কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়। মায়ের মুখের দিকে তাকায়। মায়ের চোখ-মুখের চেহারা কেমন যেন অস্বাভাবিক এমন তো ছিল না মা। মা এত বদলে যাচ্ছে কেন! হঠাৎ রেশমীর মনে একটা প্রশ্ন বিদ্যুৎ চমকেব মতো এসে যায়। মা পাগল হয়ে যাবে না তো?

—কি বলছিলি তুই বাবলুর সঙ্গে। আর ওই-বা কি বলছিল। লীলা বলে, আজ থেকে তুই ঘরের বাইরে যাবি না। মাছের আড়তেও যেতে পারবি না! তাছাড়া বৈরাগীর ঘরে গান শিখতেও যাবি না।

—মা। রেশমী আর নিজেকে সামলে রাখতে পারে না। মাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে। বলে, আমার জন্য আমি কাঁদছি নে মা। আমি কাঁদছি তোমার জন্যে—তুমি তো এমন ছিলে না? তোমার কি হয়েছে? কে কি বলেছে তোমায়?

লীলার চোখও ভিজে ওঠে। মেয়ের দুটি হাত বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে' তোকে নিয়ে এখন মুখে মুখে কথা। আমি আর শুনতে পারছি নে রে। আর আমার কি হয়েছে জিগেস করছিস—আমার যে কি হয়, সে আমি নিজেই বুঝতে পারি নে। তবে একটা কথা বলে রাখি, সুখের কপাল আমাদের নয়।

রেশমী মায়ের বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। লীলা হাত বুলিয়ে দেয় মেয়ের রেশম-রেশম চুলে।

চোখের জল মোছে রেশমী। বলে, আমাকে আমার মতো বাঁচতে দাও মা।

লীলা কোনো কথা বললে না। আঁচলে চোখ মুছে রান্নাঘরের দিকে গেল। রেশমী জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। এখন সে বাবলুর কথাই ভাবছে।

বেলা এগারোটা নাগাদ নাটুর বৌ-এর সঙ্গে কাজে বেরোলো রেশমী। দু'জনে পায়ে হেঁটেই এলো টাউন বাজার অব্দি।

টাউন বাজারে মসজিদ পাড়ার কাছাকাছি পৌঁছে রেশমী দেখলো আট-দশটা আড়তের মেয়েরা জড়ো হয়েছে পথের ধারে। আড়তে আজ কাজ বন্ধ। মর্মান্তিক খবরটাও কানে এলো।

চৌধুরীদের আড়তে সাকি নামে মেয়েটা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে আছে। জিরাকপুরের মেয়ে সাকি। সবাই তাকে চিনতো, ভালোবাসতো। ভিন্ন আড়তে কাজ করলেও রেশমীর সঙ্গে তার বেশ ভাবসাব ছিল। প্রায়ই সে আসতো টিফিনের সময় রেশমীর সঙ্গে দেখা করতে। সময়-সময় রেশমীও গেছে দেখা করতে।

মাঝে কদিন সাকি আসেনি রেশমীর কাছে। দিন তিনেক আগে রেশমীই গিয়েছিল তার সঙ্গে দেখা করতে। সাকিকে সেদিন কেমন মনমরা মনে হয়েছিল। কথায় কথায় রেশমীকে বলেছিল, তুমি একাজ ছেড়ে দ্যাও।

সাকি জানিয়েছিল, ইচ্ছে থাক-না-থাক তাকে এ কাজ করতেই হবে। নিজের মা নেই তার। আব্বাজান আবার তারই বয়সী একটা মেয়েকে নিকে করে ঘরে এনেছে। আব্বাজান এখন নিজের বৌ-এর আঁচলে বাঁধা। আব্বাজান দিনরাত ঘরে বসে আছে কাজকর্ম ছেড়ে। মেয়ে রোজগারের টাকা নিয়ে যাবে, সেই টাকায় সংসার চলবে।

সাকি আরো বলেছিল, এখন আমি ভালো মেয়ে নই রেশমী।

আমি আমার ইজ্জৎ বিলিয়ে দিচ্ছি। আমি এখন বেবুশ্যের অধম।

তারপর আর দেখা হয়নি সাকির সঙ্গে। আজ এসেই সাকির মৃত্যুর খবর পেল। চৌধুরীদের আড়তে সাকির লাশ এখনো ঝুলছে।

আরো নানা কথা লতায়পাতায় কানাকানি হচ্ছে। আড়তের মালিকের ভাইপো রজব আলী চৌধুরীর নেকনজরে পড়েছিল সাকি। গা বাঁচাতে অনেক চেষ্টা করেছিল। এদিকে ম্যানেজার দীন মহম্মদের সঙ্গে লটকে বসে আছে সাকি, তারপর এদিকে রজব আলীর নজর। শেষটা দীন মহম্মদের চাকরিটাই গেল।

সাকিকে নাকি কাল রাতেও দেখা গেছে আড়তের বাইরে ঘুরঘুর করতে। কেউ কেউ জিগ্যেস করেছিল, তুই এখনো কি করছিস? সাকি বলেছিল, হিসেব মেটাবো ছোট মিয়ার সঙ্গে। রজব আলীর মুখ-চলতি নাম ছোট মিয়া।

হিসেব মেটাতে রাত অব্দি ছিল সাকি। হিসেব মিটেও গেছে। এখন তার লাশ ঝুলছে আড়তে।

নানা কথার মধ্যে এ কথাও শোনা গেল ছোট মিয়া নাকি বেপাত্তা।

রেশমী এত সময় দাঁড়িয়ে সব শুনেছে। সাকির মুখটা তার চোখের সামনে ভাসছে। এদিকে সাকির জন্যে দুঃখ, অন্যদিকে আড়তের ওই মরদগুলোর ওপর ঘৃণা পাক দিয়ে উঠলো। সে তো দেখেছে, শরীরে যৌবন থাকলে সে যৌবন এখানে আগলে রাখা কঠিন। জানোয়ারগুলো সব সময় হাতে চাঁদি নিয়ে ওত্ পেতে আছে। যৌবনের এখানে অনেক দাম। চিংড়ি মাছের চেয়ে বেশি।

নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলো না রেশমী। চিৎকার করে বলে উঠলো, আমাদের শরীরে মানুষের রক্ত, আমাদের মন আছে, আমরা কাজ করি পয়সা পাই—ওই আড়তের মালিকরা কি

ভাবে। আমরা কি তাদের দাসী-বাঁদী, না আর কিছু।

রেশমীকে ঘিরে এখন সবাই। সবাই অবাক হয়ে শুনছে রেশমীর কথা। তার মুখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

রেশমীই বললে, শুধু একদিন কাজ বন্ধ করলে কিছু হবে না - আড়তে জানোয়ারদের নোংরামি যাতে চিরকালের জন্যে বন্ধ হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে।

কথার মতো কথা বলেছে রেশমী।

এরপর মেয়েরা দল বেঁধে চললো চৌধুরীদের আড়তে। পুলিশ তখন সাকির লাশ নামিয়েছে।

সাকির সারা গায়ে ক্ষতচিহ্ন। কাপড়চোপড়ে রক্তের দাগ। মুখটা বিকৃত হয়ে আছে।

সাকিকে দেখেই আঁতকে উঠলো রেশমী। নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলো না বলে উঠলো, সাকিকে মেরে ফেলে ঝুলিয়ে দিয়েছে। ওই দ্যাখো, গায়ে নখের আঁচড়, ওই দ্যাখো—

একজন পুলিশ একরকম জোর করেই রেশমীকে সরিয়ে দিলে। বাধা পেয়ে আরো জ্বলে উঠলো রেশমী। বললে চিৎকার করে, আমরা জানতে চাই সাকি কেন মরলো? সে নিজে মরেছে, নাকি তাকে মেরে ফেলা হয়েছে?

মেয়েরা এখন রেশমীকে ঘিরে।

লাশ হাসপাতালে চালান দিলে পুলিশ। কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ আড়তের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো। মালিকরা কেউ কাছেপিঠে নেই, তবে ফড়ে-দালালরা ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে জটলা করছে।

রেশমীর পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল জনকয়েক ফড়ে। তাদের মধ্যে কে একজন বলে উঠলো, ছুঁড়ির ঝাল যে খুব।

কথাটা রেশমীর কানে গেল। এদিক-ওদিক তাকালো। কিন্তু কে বলেছে বুঝতে পারলো না। শুধু লক্ষ্য করলো, পিছনেই একটা

চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বিষ্টু হালদার আতাবিচির মতো কালো-কালো দাঁত বার করে হাসছে। লোকটা সুদখোর দালাল। সব আড়াতেই ওর আনাগোনা। আরো শুনেছে রেশমী, লোকটা বৌ, ছেলে-মেয়ে ছেড়ে নোংরা পাড়ায় পড়ে থাকে।

রেশমীর মনে এখন শুধু উত্তেজনা নয়, এক ধরনের উন্মাদনাও। সতীর কথা মনে পড়ছে, সে-ও এদের—এই আড়তের মাংসলোভী মানুষগুলোর শিকার হয়েছিল। এ ছাড়া আরো ঘটনার কথা সে শুনেছে। আর এখন তো চোখে দেখছেই। মালতী, আয়নার মতো মেয়েরা হয়তো এমন ছিল না। এখানে কাজ করতে এসে সব খুইয়েছে।

আগুন জ্বলছে রেশমীর মনে। সে চিৎকার করে উঠলো, চলো হাসপাতাল।

আড়তের মেয়েদের নিয়ে রেশমী চললো হাসপাতালের দিকে। যেখানে সাকির দেহ চেরাই হবে।

কিন্তু হাসপাতালের চৌহদ্দির ভিতর ওরা ঢুকতে পারলো না। সেখানেও পুলিশের বাধা।

মেয়েদের এ ধরনের মিছিল টাউন বাজারে এই প্রথম। রীতিমত ভিড় হলো কৌতূহলী মানুষের। আর রেশমীকে যেন কি-এক উন্মাদনা পেয়ে বসেছে। হাসপাতালের গেটের মুখে একটা চায়ের দোকানের টুলের ওপর দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে সে অনেক কথা বলে গেল।

মেয়েরা তাজ্জব। এত কথা জানে রেশমী, এত কথা বলতে পারে সে।

তখন বিকেল।

সাকির দেহ লাশকাটা ঘর থেকে বাইরে নিয়ে এলো কজন। সাকির আব্বাজান এলো। সাকির দেহ জড়িয়ে হাউ হাউ করে কাঁদলো। তারপর সাইকেল ভ্যানে চাপিয়ে নিয়ে গেল সাকির

কাটাছেঁড়া দেহটা।

রেশমীও চললো আড়তের মেয়েদের নিয়ে। এখন নীরব তারা।

টাউনের লাগোয়া জিরাকপুর গ্রাম। বড় রাস্তার পাশেই সাকির বাড়ি। সাকির দেহটা নিয়ে সাইকেল ভ্যান আসার সঙ্গে সঙ্গে সাকির আব্বাজানের নিকের বিবি খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

তবে বেশ কিছু পড়শি অপেক্ষা করছিল সাকিদের বাড়ির উঠোনে।

বাড়ি বলতে একটা পুরনো দু'চালা। তাও জীর্ণ। ঘরের পিছন দিকে বাঁশঝাড়। সেখানে রয়েছে সাকির মায়ের কবর। তার পাশেই সাকির জন্য কবর খোঁড়া হয়েছে।

যত সময় না সাকির দেহটা কবরে শোয়ানো হয়, তত সময় মেয়ে-বৌদের অনেকেই দাঁড়িয়ে রইলো সজল চোখে। তবে কেউ কেউ আগেই চলে গেছে।

রেশমী এখন চুপচাপ। তার চোখে এতটুকু জল নেই। সে তখন শুধু একটি কথাই ভাবছে, এর পর কি!

এর পরের কথা এখনি ভাবতে পারছে না সে।

কিছুটা রাত হয়েছে। বাড়ি ফিরছে রেশমী। রিকশায়। সঙ্গে বাজার পাড়ার শুভা নামে মেয়েটি ছিল, নেমে গেল বাজারের কাছাকাছি। রেশমী একা। এবং অন্যমনস্ক সে।

গুমটি মাঠের কাছাকাছি বুড়ো শিবতলায় আসতেই রিকশার টায়ার ফেটে গেল। রিকশা থেকে নামলো রেশমী। ভাড়া চুকিয়ে দিলে। আর সামান্য পথ। এটুকু পথ হেঁটেই যাবে সে।

তিন মাথার মোড়ের কাছে ছোট একটা চায়ের দোকান। দোকানের সামনে বেঞ্চিতে বসে পল্টন আড্ডা দিচ্ছে তার চামচেদের সঙ্গে।

রেশমীকে দেখেই পল্টন বলে উঠলো, কিরে রেশমী, খুব রেলা

দেখিয়েছিস নাকি। একেবারে লীডার বনে গেছিস।

রেশমী কোনো কথা বলে না।

পল্টন বেঞ্চি থেকে উঠে আসে। বলে, আর কত খেল দেখাবি মাইরি?

রেশমী তবুও চুপচাপ।

পল্টন এবারে তার চামচেদের শুনিয়ে বলে, কিরে—বল, কেমন মাল আমি পছন্দ করেছি?

ফ্যাচফ্যাচ করে হাসলো বীরু। বললে, সে আর বলতে গুরু। ঐ তোমার চুল্লু নয়, একেবারে বিলিতি মাল।

রেশমী ঘুরে দাঁড়ালো। বললে, মেয়েমানুষ দ্যাখোনি। বাড়িতে তোমাদের মা-বোন নেই?

পল্টন বলে, রাগ করো না সুন্দরী।

রেশমী এখন রাগে টগবগ করে ফুটছে। তবু কোনো রকমে নিজেকে সামলে রাখলো।

আর এক চামচা কেপো নোংরা মন্তব্য ছুঁড়ে দিয়ে বলে, মাইরি— ছুঁড়ির সব ভালো, কিন্তু গা থেকে আঁশটে গন্ধ আসছে।

রেশমী বুঝতে পারে সে বেকায়দায় পড়েছে। এরা সব এখন নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। এরা এখন যা খুশি তাই করতে পারে। হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধির চমক এসে যায়। পল্টনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে, তুমি না আমাকে বিয়ে করতে চাও! এই বুঝি তোমার চাওয়া। এরা যা নয় তাই বলছে; আর তুমিও তাই শুনছো।

কথাটা মনে ধরেছে পল্টনের। এবারে সে তার চামচেদের ধমক দেয়। বলে, যা সব।

কেপো বলে, বাঃ গুরু, বাঃ, গাছে তুলে দেবে তুমি, আবার মইও কেড়ে নেবে?

পল্টন জোরে ধমক দেয়, আমার মুখের ওপর কথা। উচ্চিংড়ে সব।

রেশমী ভাবে, আরো একটু বাধিয়ে দিলে হয়। কিন্তু না—তাতে আবার উল্টো ফলও ফলতে পারে। তার চেয়ে ভালো, পল্টনের গায়ে একটু বাতাস-দেয়া কথা বলা। বলে, আমায় একটু এগিয়ে দেবে পল্টন ?

—চল।

পল্টন আর রেশমী চলছে। কিছু পথ এসে পল্টন বলে, জানিস রেশমী, আমি তোকে স্বপ্নেও দেখি।

—তুমিও স্বপ্ন ভ্যাখো। হাসালে দেখছি। রেশমী বলে, কখন স্বপ্ন ভ্যাখো ?

—কেন রাত্তিরে।

—রাত্তিরটাই তো তোমার দিন।

—সব রাত্তির তো দিন নয়। তাছাড়া সারারাত তো জাগি না। বলে পল্টন জানতে চায়, তুই আমাকে পছন্দ করিস না কেন বল তো ?

—আমার পছন্দ-অপছন্দই নেই।

—আমি জানি তুই বাবলুকে ভালোবাসিস।

বাবলু নামটা রেশমীর কানে খচ করে লাগলো। অথচ এই নামটা কত প্রিয় ছিল তার। পল্টন লক্ষ্য করে রেশমীর ভাবান্তর। বলে, কিরে কিছু বল।

—আমি তো অনেক কিছুই ভালোবাসি। পাড়ার বাউণ্ডুলে কুকুরটাকেও তো নিজের পাতের ভাত ধরে দিই।

—কি কথায়, কি কথা বলছিস। পল্টন বলে ওঠে, আমাকে বুদ্ধু ভেবেছিস, না ?

রেশমী মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে, তোমাকে বুদ্ধু বলে কে! তুমি যদি বুদ্ধু হবে, তাহলে আমরা তো এখনো জন্মাইনি।

গুমটি মাঠের কাছাকাছি ল্যাম্পপোস্টের নিচে পুলিশের জীপ দাঁড়িয়ে আছে। দেখে পল্টন আর এগোতে চাইলো না। বললে,

তুই যা রেশমী—আমি এখন আর যাবো না।

পল্টন দ্রুত পা চালিয়ে চলে গেল। রেশমী মনে মনে একটু হাসলো, এই পর্যন্ত।

বাড়ি ফিরে রেশমী দেখলো সোনামাসি আর মা বারান্দায় বসে গল্প করছে। রেশমী পাশ কাটিয়ে ঘরে এলো। শাড়িটাড়ি ছাড়তেও ইচ্ছে হলো না তার। টান টান হয়ে শুয়ে পড়লো তক্তাপোশের ওপর। সাকির মুখটা এখন ওর চোখের সামনে ভাসছে।

রাত এগারোটা। সোনামাসি আর মা তখনো কথা বলছে বারান্দায়।

এই রাতে সোহাগী এলো। রেশমীকে ডাকলো। রেশমী এত রাতে সোহাগীকে দেখে অবাক হলো। বললে, কিরে-এত রাতে?

চুপিস্বরে বললে সোহাগী, তুই আর মাছের আড়তে যাইস না রেশমী। মালিকেরা তরে হেনস্থা করবো।

রেশমী বললে, কেন—আমি কি তাদের চালের নিচে বাসকরি। কাজ করি পয়সা পাই। মাগনা তো দেয় না। জানিস সোহাগী আমরা যদি এককাট্টা না হই, তাহলে ওরা যা খুশি তাই করবে। আজ সাকি মরেছে, কাল তুই মরবি, পরশু আমি মরবো। কেন মরবো বলতে পারিস?

সোহাগী তবুও বলে, আমার কিন্তু ভয় হয়—তুই জানস না ওই আড়তের লোকজনদের।

রেশমী বলে, জানি—ওদের আমি ভালো করেই জানি। আমি নই, আমরা চাই ওরাও আমাদের জানুক।

সোহাগী চেয়ে থাকে রেশমীর মুখের দিকে। বলে, জানস আইজ চারিদিকে শুধু তোরই কথা। যারা চ্যানে তাগো কথা ছাইড়া দে, হে আর কয়জন। যারা চ্যানে না, তরে চোখে দ্যাখে

নাই, তাগোরও মুখে একই কথা—র‍্যাশমী আর র‍্যাশমী। সত্যি র‍্যাশমী, দেখাইলি তুই!

রেশমী হাসে। বলে, আমি তোদেরই মতন। তোরা যে কথা মনের মধ্যে পুষে রাখিস, আমি সে কথা বলতে পারি। আজ বলেছিও। জানিস সোহাগী, আমরা যদি এককাট্টা হই, দেখবি ওই আড়তদারেরা জব্দ হয়ে যাবে।

সোহাগী বলে, হগ্‌গনেই তো তর আর আমার মতন না।

রেশমী বলে, তুই আমি সবাই নই—আমবা যে যার মতন। তবু তার মধ্যে এক জায়গায় দাঁড়াতে হবে। ঠিক আছে—দেখা যাক কি হয়।

এতক্ষণে ঘরে ঢুকলো লীলা। সোহাগীরও কথা শেষ। বললে, আমি যাইতাছিরে। কইয়া গেলাম, আমিও তর সঙ্গে আছি।

সোহাগী চলে গেল। রেশমী ভাবনা নিয়ে বসে রইলো খানিক সময়। তারপর মায়ের মুখের দিকে তাকালো।

লীলার কানে আজকের সব কথাই গেছে। কিন্তু সে কথা নিয়ে কোনো কথা বললে না। তবু বললে, রাত হয়েছে—খেয়ে নে।

নানা চিন্তাব মধ্যে রেশমীর রাত শেষ হলো। মাঝে এক একবার ঘুম এসেছিল এই পর্যন্ত, তবে সে ঘুম বারবার ভেঙে গেছে।

আজও রাতশেষের নামগানের আসরে গেল না রেশমী। রাত-ভোরেই ছোটলালের রিকশা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। যারা মাছের আড়তে কাজ করে, তাদের বাড়ি গেল। একটি কথাই শোনালো, মাছের আড়তে আমরা কাজ করবো, কিন্তু অন্যায় অত্যাচার আমরা সহ্য করবো না।

সামনাসামনি সবাই কথা দিলে রেশমীর সঙ্গে থাকবে। কিন্তু রেশমী জানে, বেশ কয়েকজন আছে, তারা চায় না এ-সব ঝামেলায় যেতে। আবার এমনও আছে যারা জীবন বাঁধা রেখেছে আড়তদারদের কাছে।

এখানে-ওখানে ঘুরে সাঁইপালার কাহার পাড়ায় কৌশল্যার বাড়ি যাচ্ছিল রেশমী। এখন সে একা নয়, সঙ্গে রেহেনা বিবি আছে। মুনসীবাগানের মুখেই দেখা হয়ে গেল বরফকলের দেবুর সঙ্গে। দেবু সাইকেল চেপে আসছিল।

—আমি তোমাকেই খুঁজছি রেশমী।

—আমাকে!

দেবু বরফকলের কর্মী ইউনিয়নের নেতা। রেশমী একদিন টাউন হলের মাঠে তার বক্তৃতাও শুনেছে। বাবার সঙ্গে সে-ও গিয়েছিল মিটিং-এ।

—তোমার সঙ্গে কথা আছে রেশমী।

—বলো।

—এখানে নয়, অন্য কোথাও চলো।

কৌশল্যার বাড়িতেই দেবুর সঙ্গে কথা হলো রেশমীর।

মাছের আড়তের সঙ্গে বরফকলের একটা যোগ আছে। বরফ যোগান না পেলে মাছের আড়তের কাজ-কারবার বন্ধ হয়ে যায়। আর কলকাতা থেকে বরফ আনা—সে রাস্তাও বন্ধ করতে হবে।

কথা এখানে অনেক নয়, একটাই সহজ কথা—রেশমীরা যদি মাছের আড়তে কাজ বন্ধ করে, তাহলে তাদের সমর্থনে বরফকলের কর্মীরাও কাজ বন্ধ করবে।

রেশমীর চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে, পারবে দেবুদা?

দেবু বলে, কেন পারবো না—টাউনে চার-চারটে বরফকল, আমরা সবাই এক। ঠিকই করেছি, তোমরা কাজ বন্ধ করলে আমরাও কাজ বন্ধ করবো। আর এটা তো সত্যি কথা, মাছের আড়ত আর মেছোঘেরিগুলো শয়তানের আখড়া।

রেশমী তাকালো দেবুর মুখের দিকে।

দেবু বললে, তুমি যা করেছো এ কাজ এ টাউনে আজ অব্দি কেউ করেনি। যেখানে যাচ্ছি, সেখানেই তোমার কথা।

—আমি এমন কি করেছি দেবুদা? রেশমী বলে, আমি তো এত কথা ভাবিনি।

—তুমি জানো না তুমি কি করেছো। দেবু বললে, এখন মোদ্দা কথাটা শোনো—

সাকির মৃত্যুর বিচার বিভাগীয় তদন্ত চাই-এই হবে আমাদের দাবি। যত সময় না এ দাবি সরকার না মানে, ততদিন আমাদের লড়াই চলবে।

রেশমী একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। দেবুদার কথা সে শুনেছে, কিন্তু এখনো ঠিকমত ধরতে পারেনি। এ-সব কথা তো সে কোনোদিন ভাবেনি। ভাবতে চায়ওনি।

—কি ভাবছো?

—না। এমন কিছু না। রেশমী তাকালো দেবুর মুখের দিকে।

—কি দেখছো?

—তোমাকে।

এবারে রেশমীকে আড়ালে ডাকলো দেবু। নিচু গলায় বললে, একটা কথা, সাবধানে থাকবে—মনে রেখো, কেউটে সাপের লেজে তুমি পা দিয়েছো।

রেশমী মৃদু শব্দ করে হাসলো। বললে, না হয় ওরা আমাকে মেরে ফেলবে, এই তো। মরতে আমার ভয় নেই দেবুদা।

রেশমীর দুটি চোখ দপ করে জ্বলে উঠলো।

।। সাত ।।

টাউন বাজারে ঝড় তুলেছে গুমটি মাঠের মেয়ে রেশমী।

কদিন মাছের আড়তে কাজ বন্ধ। সেই সঙ্গে বরফকলও।

রেশমী সারাদিন টো টো করে ঘুরছে। তবে যত রাতই হোক, ফিরে আসে। আসার সময়ে ছোটলালের রিকশায় আসে। রাত অব্দি রেশমীর অপেক্ষায় টাউন হলের সামনে রিকশা নিয়ে অপেক্ষা

করে ছোটলাল।

প্রতিদিনের মতো আজও সকালে রেশমী বেরিয়ে পড়লো। আজ সকাল দশটায় ঘরোয়া বৈঠক আছে সামু গাজীর বাড়ি

রাস্তায় এসেই বাবলুর মুখোমুখি হলো রেশমী। রেশমী কথা না বলে চলে যাচ্ছিল, বাবলুই ডাকলো।

রেশমী দাঁড়ালো। বললে, কিছু বলবে?

বাবলু বললে, আমরা গুমটি মাঠ ছেড়ে চলে যাচ্ছি

রেশমী বললে, শুধু এই কথাটা শোনাবার জন্যে ডাকলে। না, আর কিছু বলব?

বাবলু কিছু বলতে চাইছে, কিন্তু বলতে পারছে না

রেশমী এবারে বাবলুর মুখোমুখি দাঁড়ালো। বললে, তুমি আমার কাছ থেকে সরে গেছো—এর পর গুমটি মাঠে থাকবে কি থাকবে না, তাতে আমার কি যায় আসে।

বাবলু একটু চঞ্চল হলো। এদিক ওদিক তাকালো। তারপর রেশমীর হাত দুটি ধরে ফেললো। বললে, বিশ্বাস করো রেশমী—আমি তোমায় এখনো ভালোবাসি। কিন্তু—

কথা শেষ করতে পারলো না বাবলু। রেশমী বললে, হাত ছাড়ো। আমাকে যেতে দাও। তুমি আমায় দূরে সরিয়ে দিয়ে আমার উপকারই করেছো। আমি আগে জানতাম না, জীবনটা এত বড।

রেশমী আর দাঁড়ালো না। পা চালালো বড রাস্তার দিকে। রাস্তার মুখেই রিকশা পেয়ে গেল।

রেশমীকে নিয়ে রিকশা ছুটলো বড় রাস্তা দিয়ে। রেশমী লক্ষ্য করলো, চলতি পথে কিছু কিছু কৌতূহলী চোখ তার ওপর এসে পড়ছে।

ঘরোয়া বৈঠক বসেছে নিকিরি পাড়ায় সামু গাজীর বাড়ি। সামু খোঁড়া মানুষ। গাছ থেকে পড়ে গিয়ে জখম হয়েছিল। শুধু জান

বেঁচে আছে। পা দুটি গেছে চিরদিনের জন্যে।

সামু গাজীর বৌ আমিনা কাজ করতো দুলাল সরকারের আড়তে। শরীরে তার টসটসে যৌবন। এই যৌবন নিয়েই কাজ করতে যেতো আড়তে। ঘরের মানুষ সামু আর চার বছরের মেয়েটার মুখ চেয়ে। যা হোক করে সংসার চালাচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজ ছেড়ে দেয়। নসীব ভালো, তাই সেই রাতে ইজ্জৎ নিয়ে ফিরতে পেরেছিল আমিনা।

আমিনার সে রাগ এখনো যায়নি। এখনো মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখে বুকচাপা চিৎকার করে। স্বপ্নের মধ্যে একটা নামও উচ্চারণ করে। সে নাম রজব মিয়ার। যার জন্যে সাকি মরেছে।

সামু বলে, কি ছেলো ওই রজবের। ও তো কলিমের হাঁটানে ছাওয়াল। আমার বাড়ি খেয়ে মানুষ। ওর সৎমা ওকে ভাত দিতো না। সেই রজবই কিনা আমার বিবি, যাবে সে চাচী বলে ডাকতো, তার ইজ্জৎ নিতে চেয়েছিল। অরে সামনে পেলে মুণ্ডুটা ছিঁড়ে নেবো।

দেবু বলে, ওসব কথা এখন থাক, আমিনা ভাবী আমাদের সঙ্গে আছে এইটাই বড় কথা। একটা কথা, ভাবী যদি আমাদের সভায় এ কথা বলতে পারে—

বলে আমিনার মুখের দিকে চায় দেবু।

—কেন পারবো না। আমি অদের মুখোশ খুলে দেবো। ওই রজব আলী, দামু দত্ত, সাধন বিচালি, ফকির মিয়া—অদের সব কথা আমার জানা। শুধু আমি কেনে, সবাই জানে।

রাগে উত্তেজনায় আমিনা কাঁপতে থাকে। বলে, কিন্তু ওই আয়না বিবি, মালতী, কোকিলা, ফতিমারা কি করবে?

উত্তরটা রেশমী দেয়। কেবল, তারা তাদের জায়গাতেই আছে। ওদের আমরা ডাকতেও চাই না।

দেবু একমত হতে পারে না রেশমীর সঙ্গে। বলে, তবে আমি চাই

ওদের ডাকতে   এমনও তো হতে পারে ওরা মনের দিক থেকে জানোয়ারগুলোর খপ্পরে যেতে চায়নি।

রেশমী বলে, কিন্তু আমি জানি ওরা আসবে না। তুমি ওদের চেনো না দেবুদা।

দেবু বলে, আমরা তবু যাবো। না আসে না আসবে। কিন্তু আমাদের যেন বলতে না পারে, তোমরা কেন আমাদের ডাকোনি?

সোহাগী আর রেহেনা কাল একসঙ্গে আসছিল। তারা জানালো, কাল সন্ধ্যায় আয়নাকে দেখা গেছে নবী মিয়ার সঙ্গে।

তবু ওরা দল বেঁধে চললো আয়না আর মালতীর কাছে। আয়নার দেখা পেল না। তার মা ওদের বসতেও বললে না। আর মালতী তখন সেজেগুজে বেরোচ্ছে সিনেমায় যাবে বলে। কথা বলার সময় তার নেই।

কোকিলা আর ফতিমার বাড়ি ওরা গেল না।

বিকালে আজ বরফকলের কাছাকাছি প্রাইমারি স্কুলের মাঠে মাছের আড়তের মেয়েরা আর বরফকলের কর্মীরা একসঙ্গে মিলবে—সকাল থেকে তারই আয়োজন চলছে।

আড়তদাররা চুপ করে বসে নেই। তারাও সলাপরামর্শ করছে কিভাবে মেয়েমানুষগুলোকে জব্দ করা যায়। ঘরে নেই দানাপানি, তারা আবার পাঞ্জা লড়ছে।

বরফকলের মালিকদের অতো মাথাব্যথা নেই। তারা জানে, তাদের কাঁচামাল নষ্ট হবার ভয় নেই। তাছাড়া কদিনই বা বন্ধ রাখবে। তাদের কর্মীরা কাজ বন্ধ করেছে মাছের আড়তের মেয়েদের সমর্থনে।

বেলা তিনটে বাজতেই স্কুলের মাঠে দল বেঁধে আসতে লাগলো মেয়েরা। বরফকলের কর্মীরাও আসছে। এরই মধ্যে দেখা গেল দেবু আর রেশমীকে রিকশা থেকে নামতে। সকাল থেকে এই পর্যন্ত ঘুরছে তারা। দুজনেই রৌদ্রদগ্ধ, বিধ্বস্ত।

আড়তদারের ফড়ে-দালালরাও আশপাশের দোকানে গুলতানি

করছে। বাজার পাড়ার বদ ছোকরারাও এসেছে। তারা এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

এরই মধ্যে দেখা গেল আয়না বিবি রিকশা চেপে কোথাও যাচ্ছে। একা নয়, তার রিকশায় যণ্ডা গোছের একজন মরদও ছিল। অচেনা মুখ। এর আগে কখনো দেখা যায়নি।

বিকাল সওয়া চারটেয় মিটিং আরম্ভ হলো। দেবুই প্রথমে যা কিছু বলার বললে। কথা তো এমন কিছু নয়, মাছের আড়তে যে সব কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি চলে এ-সব যদি বন্ধ না হয় তাহলে তারা তাদের প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। শুধু টাউন বাজারে মাছের আড়ত নয়, কথা প্রসঙ্গে মেছোঘেরির কথাও বললে। সেখানেও নানারকম নোংরামি চলে।

জমায়েতের ভিতর থেকে কে একজন বলে উঠলো, আমরা রেশমীর মুখ থেকে কিছু শুনতে চাই। সেই কণ্ঠের সমর্থনে আরো কয়েকটি কণ্ঠ সোচ্চার হলো।

রেশমী উঠে দাঁড়ালো। এর আগে কখনো সে মাইকের সামনে দাঁড়ায়নি। প্রথমটা একটু ভয় পেয়েছিল সে। পা দুটো কাঁপছিলও। কিন্তু পরক্ষণে সে ইস্পাতকঠিন হয়ে উঠলো। একবার সামনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে। তারপর সে বলতে শুরু করলে। মনের মধ্যেকার চাপা ঘৃণা, বিদ্বেষ উগরে দিলে সে। আড়তে কাজ করতে সে চোখের সামনে যা কিছু দেখেছে, সবই বলে গেল। রেশমীর যা কিছু কথা, তার মধ্যে মিশে ছিল এক ধরনের জ্বালা।

সবাই তাজ্জব। গুমটি মাঠের একটি সাধারণ মেয়ে এত কথা জানলো কি করে!

রেশমীর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে হাততালি পড়লো। রেশমী সরে এলো একান্তে। দাঁড়াতে পারছে না। উত্তেজনায় কাঁপছে সে।

দেবু ততক্ষণে ঘোষণা করে দিয়েছে আজকের মতো সভা শেষ এখানে। প্রয়োজনে আবার তারা মিলবে।

জমায়েত ভাঙতে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে মেয়েরা চলে গেল রেশমী, দেবু ছাড়া আরো কজন তখনো মাঠের একান্তে ঘাসের ওপর বসে কথা বলছে।

সন্ধ্যে হতে যে যার উঠে পড়লো।

দেবু বললে, চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

রেশমী বললে, আমি একাই যেতে পারবো দেবুদা।

দেবু বললে, জানি সাহস তোমার আছে, কিন্তু সব সময়ে তো সাহস মানায় না।

কথা বলতে বলতে তুজনে এগিয়ে চলে।

একসময় দেবুরই মনে হল কৌশল্যার কথা সবাই এলো, কিন্তু কৌশল্যা এলো না কেন?

কৌশল্যার খোঁজ নিতে ওরা সাঁইপাড়ায় এলো। কিন্তু কৌশল্যা বাড়ি নেই। ঘর তালাবন্ধ।

পাশের বাড়ির ছেলের কাছে শুনলো. তুপুরের পর চাঁপাপুকুরে বোনের বাড়ি চলে গেছে সবাই। কৌশল্যাব বোনপোকে সাপে কামড়েছে এই খবর পেয়ে।

এদিকটা নির্জন। মুন্সীর বাগান পেরিয়ে রাস্তার তু'ধারে ঘর-বাড়ি নেই বললেই চলে।

রেশমী বললে. চলো না দেবুদা, একটু বসি।

দেবু বললে, কথাটা আমিই বলবো ভাবছিলাম।

বেশমী হাসলো। বললে, একসঙ্গে একই ভাবনা একই কথা তুজনের মনে—লক্ষণটা ভালো না।

—কে বলেছে?

—আমি বলছি।

—থাক, বসবেই যদি, এখানে কেন—চলো আমাদের বাড়ি। কোনোদিন তো যাওনি।

একটা চলতি রিকশা ধরলো দেবু।

কলেজ পাড়ার কাছে দেবুর বাড়ি। ছোট বাড়ি। টালিছাওয়া দুটি ছোট ছোট ঘর। বাড়িতে মানুষ বলতে দেবুর মা আর ছোট ভাই। ভাইটা স্কুলে পড়ে।

দেবুর মা রান্না করছিল। দেবুর সাড়া পেয়েই বাইরে এলো। রেশমী প্রণাম করলো দেবুর মাকে।

—তুমিই তো রেশমী? দেবুর মা খুঁটিয়ে দেখলো রেশমীকে। বললে, তোমার কথা রোজই শুনি দেবুর মুখে। এসো, ঘরে এসে বসবে এসো।

দেবু বললে, মা, আমাদের ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে—কিছু খেতে দেবে।

দেবুর মা বললে, মেয়ে আমার আজই প্রথম এলো—ওকে তো মিষ্টি মুখ করাতেই হবে।

রেশমী বললে, ঘরে যা আছে তাই খাবো মা।

মা ডাক শুনেই দেবুর মায়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। রেশমীর চিবুক স্পর্শ করে বললে, তোমার ভালো হবে মেয়ে।

স্নেহের ছোঁয়ায় সিক্ত হলো রেশমীর মন। কি জানি কেন, তার দুটি চোখ ভিজে গেল হঠাৎই।

দেবু ঘরের বাইরে চলে এলো। আঁচলে চোখ মুছলো রেশমী। নিজেকে সহজ করতে চাইলো, কিন্তু পারলো না। হঠাৎ স্নেহের ছোঁয়ায় উতলা সে।

রেশমী বলেছিল সে একাই যেতে পারবে। কিন্তু দেবু কোনো কথাই কানে নিলে না, রেশমীকে পৌঁছে দিতে চললো।

টাউন হলের সামনে ছোটলাল তার রেশমী দিদির অপেক্ষায় ছিল। দেবুকে নিয়ে রেশমী উঠলো ছোটলালের রিকশায়।

কিছুটা সিধে রাস্তা ধরে এসে ছোটলাল বাঁ হাতের গলিপথে ঢুকলো। এ পথ দিয়েও গুমটি মাঠে পৌঁছনো যায়।

রেশমী বললে, কিরে, এ রাস্তায় যাচ্ছিস কেন ?

—ঠিকই যাচ্ছি। কোনো কথা বোলো না রেশমী দিদি, চুপচাপ বোসো।

· কেন বল্ তো ?

—শুধু একটা কথা শুনে রাখো, বড় রাস্তায় জোড়া বটতলার কালভার্টের পাশে ওরা আছে।

—কারা ?

—কারা আবার, পল্টনের দল।

রেশমী বললে, তাহলে তো ভালোই, চল না বড় রাস্তা দিয়ে।

--না।

ছোটলাল গলিপথ ধরে রিকশা ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। দেবু আর রেশমী নিবিড় হয়ে বসে আছে। রেশমীর একটি হাত কখন যেন দেবুর হাতের ওপর এসেছে।

গুমটি মাঠের বাইরে ছোটলাল রিকশা দাঁড় করালো। বললে, এটুকু পথ হেঁটে যাও রেশমী দিদি।

—ঠিক আছে আমি যাচ্ছি। এ তো দু'মিনিটের পথ' রেশমী বললে, তুই বরং দেবুদাকে পৌঁছে দিয়ে আয়।

দেবু যেতে চেয়েছিল রেশমীর সঙ্গে। কিন্তু রেশমী বারবার বললে, এটুকু পথ সে একা যেতে পারবে। সে তো বাড়ির কাছেই পৌঁছে গেছে।

ঘরে ফিরেই লীলার মুখে পড়লো রেশমী।

—কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?

—ঘরে ছিলাম না, এই তো। রেশমী সাফ জবাব দেয়, বাইরে ছিলাম।

—লজ্জা করে না তোর। সোমত্ত মেয়ে টঙটঙ করে ঘুরছিস।

—মা।

—শোন, আজ শেষ কথা বলে দিচ্ছি, আসছে মাসেই আমি তে বিয়ের দিন ঠিক করেছি।

—তোমার জামাইটি কে ?

—কে আবার, পল্টন।

—খাসা জামাই। রেশমীর কণ্ঠে বিদ্রূপের সুর। বলে, মা, তুমি না বলতে পল্টন ছেলেটা একটা দুশমন, পল্টনের মাসি ঢলানি মেয়েমানুষ—তুমি না ওদের দেখে মুখ ফিরিয়ে নিতে ? তুমি এত বদলে গেলে কি করে ?

লীলা ফিরে দাঁড়ায়। তার দৃষ্টি কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হয় রেশমীর। নিজেকে সামলে রাখতে পারে না সে। বলে, মা—তুমি কি চাও বলো তো ? তুমি কি আমার মা নও ?

লীলা সজোরে চড় মারে মেয়ের গালে। তারপরই হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে লীলা।

রেশমী স্থির হয়ে যায়। তারও চোখ দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরে পড়ে।

বাইরের বারান্দা থেকে শ্যামলী নামের খাঁচায় বন্দিনী টিয়া ডেকে ওঠে রেশমীর নাম ধরে।

রেশমী নামটা স্পষ্ট উচ্চারণ করে শ্যামলী।

মাঝরাতে হল্লা উঠলো গুমটি মাঠে।

শেষ ট্রেনের যাত্রীকে টাউন বাজারে পৌঁছে দিয়ে খালি রিকশা নিয়ে ফিরছিল ছোটলাল। গাবতলার মোড়ে অন্ধকারের মধ্যে কজন ছেলে তাকে বেধড়ক পিটুনি দিয়ে রিকশা নিয়ে বেরিয়ে গেছে। ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় ছোটলালকে তুলে এনেছে হারু বৈরাগী। হারু গিয়েছিল শবযাত্রার সঙ্গে শ্মশানে হরিনাম করতে।

গুমটি মাঠের আরো মানুষের সঙ্গে পল্টনও ছুটে বেরিয়ে এসেছে।

রেশমী বেরিয়ে এসেছে। তার মনে পড়লো, আজ ছোটলাল

তাকে গলিপথ দিয়ে ঘুরিয়ে এনেছিল। ছোটলালকে তাই এই মারধোর। রেশমী বোঝে, এ পল্টনের কাজ। সে তার দলের ছেলেদের এগিয়ে দিয়ে নিজে ভালোমানুষ সেজে ঘরে বসে আছে।

পল্টন ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসে। তেড়েফুঁড়ে বলে, বল ছোটলাল কোন শালারা এ কাজ করেছে।

ছোটলালের সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। পল্টনের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে বাঁকা হাসি ফুটে ওঠে। কিন্তু কোনো কথা বলে না। পল্টন গায়ে পড়া হয়ে ছোটলালকে পাঁজা করে তুলতে যায়। যদিও সর্বাঙ্গ আঘাতে জর্জরিত, তবু গা ঝটকা দেয় ছোটলাল। বলে, তুমি যাও পল্টনদা।

পল্টনের চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। বলে, তুই কি ভেবেছিস ছোটলাল?

রেশমী এত সময় চুপ করেছিল। এবারে বলে ওঠে, পল্টনদা-ও যখন চায় না তোমাকে তখন কেন ওকে বিরক্ত করছো?

—তুই কি বলতে চাস? পল্টন জবাফুলের মতো লাল চোখ তুলে তাকায় রেশমীর চোখের দিকে। বলে, রেলা দেখাগে মাছের আড়তের মাগীদের কাছে।

পল্টন এগিয়ে আসছিল, কিন্তু সোনামাসি তাকে একরকম জোর করেই টেনে নিয়ে যায়।

ছোটলালের মা তখন ডুকরে কাঁদছে।

রিকশা নিয়ে আসে বটুক। ছোটলালকে রিকশায় তুলে দেয় হারু বৈরাগী। রেশমী যেতে চায় হাসপাতালে, কিন্তু তাকে যেতে দেয় না হারু।

শেষ রাতে বটুক আর হারু ফিরে এলো। হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে ছোটলালকে। আঘাত গুরুতর। কয়েকটা দিন তাকে হাসপাতালে থাকতে হবে।

আজ গুমটি মাঠের রাত শেষ হলো নাম-কীর্তনের সুরে নয়,

ছোটলালের মায়ের আর্ত কান্নায়।

হারু বৈরাগীর ঘরে আজ নামগানের আসর বসেনি।

সকাল।

বাবলু এলো রেশমীর কাছে। রেশমী কিছুটা অবাক হলো। বললে, এসো - বসবে এসো ঘরে।

বাবলু নিছক ভালো ছেলের মতো চেয়ে রইলো রেশমীর মুখের দিকে। রেশমী হাসলো। বললে, তোমার সেই গল্পটা মনে আছে বাবলু, সেই যে একটা মেয়েকে একটা ছেলে পাহাড়, সমুদ্দুরের গল্প শোনাতো।

বাবলু নিরুত্তর।

রেশমী হঠাৎ খলখলিয়ে হেসে উঠলো। বললে, জীবনটা রূপকথা নয় বাবলু। আগে বুঝতাম না, এখন বুঝি। তারপর বলো কি বলবে?

অপমান গায়ে মেখেও দাঁড়িয়ে রইলো বাবলু। বললে, আজই আমি চলে যাচ্ছি রেশমী। বৈরাগী কাকাকে বলেছি বাড়িটার জন্যে খদ্দের দেখতে।

—এ খবর আমাকে না শোনালেও পারতে। তুমি চলে যাবে, বেশ তো, যাবে।

—একটা কথা, যে কথাটা তোমাকে না বলে পারছি না, তুমি এ আগুন নিয়ে না খেললেই পারতে। তুমি জানো না, তোমার সামনে কি বিপদ।

—আরো কিছু বলবে?

—আমার ভালোবাসাটা কিন্তু মিথ্যে ছিল না। বাবলু নিচু গলায় বললে, আমি কিন্তু এখনো তোমাকে ভালোবাসি।

রেশমী হাসলো। বললে, আর কিছু কথা আছে?

বাবলু মাথা নাড়লো। আর কোনো কথা নেই তার।

রেশমী কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলতে পারলো না। দেবুদা আসছে সাইকেল নিয়ে।

ছোটলালের ঘটনা শুনেছে দেবু। শুনেই ছুটে এসেছে।

দেবু আসার সঙ্গে সঙ্গে বাবলু চলে গেল। বাবলুর কথাটা এখনো রেশমীর কানে জড়িয়ে—'আমার ভালোবাসাটা কিন্তু মিথ্যে ছিল না।'

—কি ভাবছো রেশমী? দেবু সাইকেলটা রাখলো বারান্দার নিচে।

—কি আর ভাববো, রেশমী নিজেকে সহজ করলো। বললে, এসো।

বারান্দায় মাদুর পেতে দিলে রেশমী। দেবু বসলো। লীলা বাসন মাজতে গিয়েছিল পুকুরে। ফিরে এলো মাজা বাসন নিয়ে।

—ভালো আছেন তো মাসিমা? দেবু বললে।

—আমার আর থাকা না থাকা। লীলা বাসন নামিয়ে রাখলো বারান্দায়। বললে, মদন ঠাকুরপোর খবর কি? তাকে একবার আসতে বোলো তো।

—মদনদা এখানে নেই। দেবু বললে, আবাদে খানিকটা জায়গা আছে, সেখানে গেছে। এলে বলবো আপনার সঙ্গে দেখা করার কথা।

—যাক, তোমরা ভালো আছো তো? লীলা জানতে চাইলো।

—আমাদের খবর তো জানেনেই।

—না বাবা, আমি কিছু জানি না।

—সে কি! এত কাণ্ড ঘটছে—রেশমী কিছু বলে না আপনাকে?

রেশমী চোখ ইশারা করলে। দেবু চুপ করে গেল। লীলা বারান্দায় দড়ির আলনা থেকে গামছা টেনে নিয়ে আবার পুকুর-ঘাটের দিকে চললো। স্নান করতে।

দেবু বললে, যাক শোনো—যে কথাটা বলবো বলে ছুটে এসেছি।

ছোটলালের ব্যাপারটা শুনেছি। আক্রমণটা আসতো তোমার ওপর। আর আসবেও। তাই বলছি কি জানো, মাসিমাকে নিয়ে তুমি দিন কয়েকের জন্যে আমাদের পাড়ায় চলো।

—গুমটি মাঠ ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না দেবুদা। রেশমী প্রত্যয়ের সঙ্গে বললে, আর একটা কথা কি জানো, পালিয়ে বাঁচা যায় না। যাক গে ওসব কথা, এখন চলো হাসপাতালে ছোটলালকে দেখে আসি। সাইকেল এখানে থাক, চলো আমরা হেঁটেই চলে যাই। আর না হয় এক কাজ করো, যদি তোমার লজ্জাটজ্জা না করে—আমাকে সাইকেলের সামনে বসিয়ে নিয়ে চলো। কি পারবে তো?

—বসতে পারবে তো?

—দ্যাখোই না পারি কিনা।

সাইকেলের সামনে বসলো রেশমী। দেবু সাইকেল ছুটিয়ে দিলে। কিছু চোখ এসে পড়লো রেশমীর ওপর।

হাসপাতালে ঢোকার মুখেই ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল পল্টনের। একটা চায়ের দোকানের বাইরের বেঞ্চিতে পল্টন বসেছিল ক'জন চামচাকে সঙ্গে নিয়ে।

রেশমীকে দেবুর সাইকেলের সামনে দেখে ওদেরি মধ্যে কেউ সিটি দিয়ে উঠলো। দেবু সাইকেল থেকে নামতে গিয়েও নামলো না। চলে এলো হাসপাতালের ভিতরে।

ঘুমোচ্ছে ছোটলাল। দেবু আর রেশমী চোখের দেখা দেখলো এই পর্যন্ত। যে নার্স ডিউটিতে ছিল, জানালো, কেসটা খুব ভালো নয়। তবে শেষ পর্যন্ত বিপদ কেটে যেতে পারে।

রেশমীর মনটা খারাপ হলো। কাল রাতে যখন ওকে গুমটি মাঠে নিয়ে আসে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায়—তখনো সে কত কথা বলছিল। তখন মনে হয়নি ওর আঘাত এত বেশি।

হাসপাতাল থেকে ওরা পায়ে হেঁটেই ফিরছিল। বেরিয়ে দেখলো,

পল্টনকে ঘিরে তার চামচাগুলো তখনো চায়ের দোকানে আড্ডা দিচ্ছে।

রেশমী আর দেবুকে দেখে ওরা হাসাহাসি করে উঠলো। পল্টন ধমকে উঠলো, এ্যাই কি হচ্ছে।

রেশমী ফিরে দাঁড়াচ্ছিল। দেবু বাধা দিলে। বললে, নাও—সাইকেলে উঠে পড়ো।

—তার চেয়ে চলো হাঁটতে হাঁটতে যাই।

ওরা পাশাপাশি চলছে পায়ে হেঁটে। একসময় রেশমী জিজ্ঞাসা করে, মানুষ এত জঘন্য হয় কেন বলতে পারো?

-প্রশ্নটা অনেক পুরোনো। দেবু বললে, উত্তরও আছে, তবে তা নিছক মামুলি।

কিছুটা এগিয়ে এসেছে ওরা। দেখলো, কৌশল্যা আসছে শুমি বলে মেয়েটার সঙ্গে। ওরা গুমটি মাঠে গিয়েছিল রেশমী আর দেবুর খোঁজে। সেখানে না পেয়ে এদিকে আসছে।

রিকশা থেকে নামলো কৌশল্যা। বললে, দেবু—নবী মিয়া মোটর সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছে, বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে, ভয় দেখাচ্ছে মেয়েদের। ক'জন নাকি বলেছেও কাজে যোগ দেবে।

দেবু বললে, এ চেষ্টা তো ওরা করবেই কৌশল্যাদি। এক-আধজন কিছুটা ভয়ও পাবে। কিন্তু মনের ইচ্ছেয় কেউই কাজে যেতে চাইবে না।

—কিন্তু যদি যায়?

—একটা কিছু করতে হবে।

শুধু এই কথা হতে যতটুকু সময়। এরই মধ্যে ওরা দেখলো মোটর সাইকেল ছুটিয়ে নবী মিয়া আসছে। পিছনে বসে ষণ্ডা গোছের একজন লোক, সেদিন যাকে আয়না বিবির সঙ্গে রিকসায় দেখা গিয়েছিল।

নবী মিয়া ঝড়ের গতিতে মোটর সাইকেল ছুটিয়ে চলে গেল।

—রেশমী - দেবু ডাকলো।

—উঁ, অন্যমনস্ক রেশমী ফিরে তাকালো দেবুর মুখের দিকে।

—কি ভাবছিলে?

—আমরা কোথায় যাচ্ছি?

-যেখানে যেতে চাই। দেবু বললে, সাইকেলে ওঠো—আর হাঁটতে ভালো লাগছে না।

রেশমীকে নিয়ে দেবু সাইকেল ছুটিয়ে দিলে। রেশমীর শাড়ির আঁচল উড়ছে, উড়ছে তার মাথার রেশম-রেশম চুল। এই দুরন্ত গতি তার ভালোই লাগছে।

গতিই তো জীবন।

রেশমীকে পৌঁছে দিয়ে দেবু চলে গেল। রেশমী বলেই দিয়েছে আজ আর কোথাও বেরোবে না সে।

দুপুরে কিছুক্ষণের জন্যে ঘুমিয়েছিল রেশমী। ঘুম ভাঙলো বাবলুর ডাকে। 'চলে যাচ্ছি' কথাটা বলতে এসেছে বাবলু।

কথাটা বাবলু বললে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। রেশমী সহজভাবেই নিলে কথাটা। পারো তো মাঝে মাঝে খবর দিয়ো।

—আর কিছু বলবে না? বাবলুর চোখ সজল হয়ে উঠলো।

—তোমার চোখে জল আসছে কেন বাবলু? রেশমী মুখে হাসি ফুটিয়ে বললে, আমি কিন্তু হাসিমুখেই তোমাকে বিদায় জানাচ্ছি। সকালে তোমাকে আমি হয়তো আঘাত দিয়েছি, পারো তো ক্ষমা করে নিয়ো।

—আমি যাচ্ছি রেশমী।

—যাচ্ছি বলতে নেই। বলো আসি। জানি আসবে না, তবুও।

বাবলু চলে গেল। রেশমীর মনটা হঠাৎ শূন্য হয়ে গেল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখলো বাবলু তার মাকে নিয়ে রিকশায়

উঠছে। আর একটা রিকশায় সংসারের টুকিটাকি জিনিসপত্তর।

রেশমীর চোখে জল এলো। এখন অনেক কথা তার মনে। আর সে সব কথা বাবলুকে নিয়ে।

লীলা ঘরে ছিল না। ফিরে এলো। মেয়েকে থমথমে মুখে বসে থাকতে দেখে জিগেস করলো, কিরে—চুপচাপ বসে আছিস কেন?

—একা বসে কি দেয়ালের সঙ্গে কথা বলবো?

রেশমীর কথাটা পছন্দ হলো না লীলার। বললে, তুই আজকাল বড় ক্যাটকেটে কথা বলিস। যাক, শোন—তোর জন্যে যে পাড়ায় মুখ দেখাতে পারছি না।

—পাড়ায় আমার নিন্দে করার মতো একজনই তো আছে মা। সে ওই সোনামাসি।

—কেন, পিরু দাসের বৌ বলছিল, তুই নাকি দেবুর সঙ্গে এক সাইকেলে ঘুরেছিস?

—এটা পুরোনো খবর। আর কিছু বলবে?

—বলবো। লীলা বললে, সোনা দিদির সঙ্গে আমি কালীবাড়ি পাড়ায় যাত্রা শুনতে যাবো। ফিরতে রাত হবে। ভালো করে দরজা-টরজা বন্ধ করে থাকিস।

রেশমী কোনো কথা বললে না। লীলাও আর কথা বাড়ালো না।

রাত সাড়ে আটটায় সোনামাসির সঙ্গে বেরিয়ে গেল লীলা। রেশমী ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে দিলে।

চুপচাপ শুয়ে আছে রেশমী। মনের মধ্যে এখন বাবলু।

বাবলুর মুখটা একসময় মন থেকে হারিয়ে গেল। আর একটি মুখ এখন মনের মধ্যে। সে মুখ দেবুর।

দেবুর মুখটা মনের মধ্যে রেখেই ঘুমিয়ে পড়লো রেশমী।

মাঝরাতে রেশমীর ঘুম ভেঙে গেল টিয়াপাখির ট্যাঁ ট্যাঁ

চিৎকারে। পাখিটাকে অন্য রাতে ঘরে রাখে, আজ তুলতে ভুলে গিয়েছিল। ভাবলো, হয়তো বেড়াল এসে উৎপাত করছে। একটা বাউণ্ডুলে হুলো বিড়াল মাঝে মাঝে আসে।

উঠে বসলো রেশমী। বারান্দার দিকের খুপরি জানালা খুলে দেখলো। খাঁচাটা দেখা যাচ্ছে না। টিয়া সমানে ডানা ঝাপটাচ্ছে আর ডাকছে।

—কি হয়েছে রে শ্যামলী ?

নাম ধরে ডাকার সঙ্গে সঙ্গে টিয়ার চিৎকার আরো বেড়ে গেল। রেশমী খানিক ইতস্তত করলো দরজা খুলবে কি খুলবে না। শেষ পর্যন্ত দরজা খুললো।

দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে পল্টন ঝাঁপিয়ে পড়লো রেশমীর ওপর। বললে, চিৎকার করবি তো গলা টিপে মেরে ফেলবো।

শ্যামলী তখনো সমানে চিৎকার করে চলেছে।

রেশমীর একটা হাত ধরে রেখেছে পল্টন। তাকে ঘরের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে চাইছে। রেশমীর মনে হলো, মাকে নিয়ে সোনামাসির যাত্রা শুনতে যাওয়া—এটা সোনামাসি আর পল্টনের পরিকল্পিত ব্যাপার। কিন্তু এটাও জানে, এখন কোনো কথা বলতে যাওয়া মিছে। তাছাড়া পল্টন এখন নেশায় বুঁদ হয়ে আছে।

—কিরে রেশমী -ফুলশয্যাটা আজই সেরে ফেললে কেমন হয় ?

রেশমীকে জাপটে ধরতে গেল পল্টন। রেশমী আচমকা মোক্ষম কামড় বসিয়ে দিলে পল্টনের হাতে।

অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো পল্টন। হ্যাঁচকা টানে হাতটা টেনে নিলে। এক খাবলা মাংস ছিঁড়ে এলো রেশমীর দাঁতের সঙ্গে। থু-থু করে মাংসের দলা ছিটিয়ে ফেলেই রেশমী পড়ি-কি-মরি ছুট দিলে। বৈরাগী কাকার ঘরের দরজায় গিয়ে সজোরে ধাক্কা দিয়েই দরজার কাছে বসে পড়লো। চিৎকার করে ডাকবে সে শক্তি নেই। গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না তার।

হারু বৈরাগী দরজা খুলে রেশমীকে দেখে অবাক হলো। ভয় পেল সে রেশমীর মুখে রক্তের দাগ দেখে।

—কি হয়েছে রেশমী ?

রেশমী কোনো কথা বলতে পারছে না। শুধু ফুলকো চোখে তাকিয়ে থাকে কিছু বলার ইচ্ছে নিয়ে।

বৈরাগী বৌ রেশমীকে ধরে ভিতরে নিয়ে এলো। বিশাখা-ললিতা দুই বোন জেগে উঠেছে, তারাও অবাক। বুঝতে পারছে না কি হয়েছে রেশমী দিদির।

বৈরাগী বৌ-এর কোলের ওপর মাথা রেখে রেশমী শুয়ে আছে ভিজে গামছা দিয়ে বৈরাগী বৌ মুছে দিল রেশমীর মুখের রক্ত। হারু বৈরাগী জল-হাত বুলিয়ে দিলে রেশমীর ঘাড়ে মাথায়।

বৈরাগী বৌ জানতে চায় কি হয়েছে রেশমীর। রেশমী কথা বলতে পারছে না। শুধু শূন্য দৃষ্টিতে ফিরে চাইছে বৈরাগী কাকিমার মুখের দিকে।

একসময় রেশমীর দু' চোখ বন্ধ হয়ে যায়। যেন ঝড়ের পর শান্তি এসেছে।

রেশমী এখন গভীর ঘুমের মধ্যে হারিয়ে গেছে।

।। আট ।।

রাতভোর।

আজও নাম-কীর্ত্তনের সুর উঠলো না হারু বৈরাগীর ঘর থেকে

লীলা গুমটি মাঠে ফিরলো সোনামাসির সঙ্গে এক রিকশায় ঘরে ঢুকতেই লীলার বুকটা কেঁপে উঠলো। খাঁচার বাইরে টিয়া-পাখিটা মরে আছে। পাখিটার ঘাড় মুচড়ে দেয়া। ঘরের দরজা খোলা। রেশমী ঘরে নেই।

শিউরে উঠলো লীলা। একটুকরো মাংস পড়ে আছে বারান্দায়। পিঁপড়ে জমেছে মাংসের টুকরোয়

লীলার মনটা দুলে উঠলো। একটা অজানা ভয়ের পাথর বুকের ওপর চেপে বসে। তাকালো নিম্বেশ্বরতলার দিকে। বটুক দাঁতন কাঠি দাঁতে ঘষতে ঘষতে পায়চারি করছে।

বটুক কিছুটা গোঁয়ার গোছের মানুষ। তবে সিধে-সহজ। অন্যায় দেখলে বে-টক্কর রেগে যায়।

লীলা আগে বটুকের সঙ্গে কথা বলতো। কিন্তু দাশুর সঙ্গে সেই ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর থেকে আর কথা বলে না: কিন্তু আজ নিজে থেকে ডাকলো বটুককে।

বটুক এগিয়ে আসে। লীলা বলে, আমার খুকিকে দেখেছো?

বটুক বলে, না।

—আমার মনটা ভালো বলছে না। খাঁচার বাইরে টিয়া মরে পড়ে আছে, ঘরের দরজা খোলা, তারপর ওই ত্যাখো বটুক ঠাকুরপো, বলে লীলা বারান্দার কোণে ছোট্ট একটু টুকরো মাংস দেখিয়ে দেয়।

ঠিক এই মুহূর্তে হারু বৈরাগীর ঘরের দরজা খুলে যায়। বটুক আর লীলা একই সঙ্গে লক্ষ্য করে বৈরাগীর ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে রেশমী।

—ওই তো তোমার মেয়ে। বটুক বলে, তোমার মেয়েরে যত দেখি, তত অবাক হই। ভাবি, দেশের সব মেয়েরা যদি এমনি হতো।

বটুক আর দাঁড়ালো না। দাঁতন ঘষতে ঘষতে চলে গেল। লীলা দেখলো, রেশমী আস্তে আস্তে এদিকেই আসছে।

টিয়াটাকে দেখেই চমকে ওঠে রেশমী। মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে তার আদরের শ্যামলী।

শ্যামলীকে হাতে নিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে রেশমী। এমন করে কখনো কাঁদেনি সে। লীলার মনটা ভিজে ওঠে। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। কিছু বলতে পারছে না। জানে, এখন কোনো কথা বলতে গেলে মেয়ে হয়তো বলবে, 'কেন তুমি আমাকে একলা রেখে যাত্রা শোনার নাম

করে সারারাত বাইরে কাটিয়ে এলে ?'

টিয়াটাকে নামিয়ে রাখলো রেশমী। আঁচলে চোখ মুছে মায়ের দিকে তাকালো। মেয়ের চোখে চোখ রাখতে পারলো না মা। যে চোখে একটু আগেই জল ঝরেছে, সেই চোখে এখন আগুন জ্বলছে।

রেশমীর কাছে এখন সব কিছু পরিষ্কার। মায়ের যাত্রা শুনতে যাওয়া, রাত কাটিয়ে ফেরা এ সবই ওই সোনামাসির ফন্দি।

রেশমীর চোখ পড়ে মাংসের টুকরোর দিকে। পিঁপড়ে জড়ো হয়েছে টুকরো মাংসের ওপর। হঠাৎ কি হয় রেশমীর, এলোমেলো ভঙ্গিতে হেসে ওঠে। তার হাসিটা কেমন অস্বাভাবিক। লীলা ভয় পেয়ে যায়।

রিকশা এসে দাঁড়ালো গুমটি মাঠে। পল্টন নামছে। তার ডান হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। হাতটা ঝোলানো গলার সঙ্গে।

সেই হাসির মধ্যে রেশমী বলে ওঠে, মা, তোমার হবু জামাই-এর হাতে ব্যাণ্ডেজ কেন ? ওই দ্যাখো রিকশা থেকে নামছে।

সোনামাসি বারান্দায় বসে চোখে-মুখে জল দিচ্ছিল। পল্টনকে ওই অবস্থায় দেখেই হাউমাউ করে ওঠে। বলে, কী হয়েছে রে পল্টন ?

পল্টন বলে, খেঁকি কুকুরে কামড়েছে।

—কি সব্বোনাশ, সোনামাসি বলে ওঠে, কুকুরে কামড়েছে ?

—ভয় নেই মাসি। পোষা কুকুর। দশটা দিন যদি কুকুর বেঁচে থাকে, তাহলে আর ইনজেকশান নিতে হবে না। জানো মাসি, খেঁকিটা এমনিতে ভালো—আদর বুঝতে পারেনি।

কথাগুলো লীলা, রেশমীও শুনছে।

সোনামাসির ভ্রূ কুঁচকে ওঠে। ওখান থেকেই সে নজর ছুঁড়ে দেয় রেশমীর দিকে। বলে, শেষটা খেঁকি তোকে কামড়ালো ?

পল্টনের মা পাছা ঘষে বাইরে আসছে। ঘরের চৌকাঠ পেরোতেই

মুখ থুবড়ে পড়লো। ঠকঠক করে কাঁপছে তার সারা শরীর।

—তুমি আবার বাইরে এলে কেন? সোনামাসি মুখঝামটা দিলে, এখন এই মাংসের দলা ঘরে নিয়ে যাবে কে?

পল্টনের মা দুটো হাতে ভর দিয়ে দেয়াল ঠেস দিয়ে বসলো। সর্বাঙ্গ তার থরথর করে কাঁপছে।

পল্টন বলে, মা-তুমি বাইরে কেন?

পল্টনের মা ছেলের মুখের দিকে তাকায়। বলে, জঞ্জাল মনে করে ফেলে দিয়ে আয় না বাইরে। ছিঃ ছিঃ—পল্টন, আমার লজ্জা করে যখন ভাবি তোরে আমি পেটে ধরেছিলাম।

সোনামাসি বললে, লজ্জা করে যখন, বাইরে এলে কেন মরতে? এই পল্টন, তোর মাকে ঘরে নিয়ে যা।

—আমি নিজেই যাচ্ছি। পল্টনের মা হাতে ভর দিয়ে পাছা ঘষে পিছু হটতে লাগলো।

পল্টনের বাবা ভজহরির ঘুম ভাঙে না বেলা দশটার আগে জড়ভরত গোছের মানুষ। দিনরাত সিদ্ধির নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। কাজের মধ্যে কাজ ফৌজদারী কোর্টের মোক্তারবাবুদের দালালি। আগে বাজার ভালো ছিল। এখন মন্দা। বেশির ভাগ দিন ঘরে বসে থাকে। পেয়ারের শালী সোনাকে নিয়েই দিন কাটিয়ে দেয়।

আজ ঘুম থেকে উঠে পড়েছে ভজহরি। বাইরে বেরিয়ে এসেছে। অনেক দিন পর আজ বৌ-এর মুখের দিকে তাকালো।

পল্টনের মা মাথা নিচু করলো।

—কি হয়েছে? ভজহরি এর-ওর মুখের দিকে চায়।

- যাও না ঘরে সোনা বলে, তোমার শোনার মতো কোনো কথা হয়নি। যাও।

ভজহরির পুরুষ মনে বিঁধলো কথাটা। কিন্তু এদের মুখের ওপর কথা বলার সাহস তার নেই। 'ঠিক আছে, ঘরে যাচ্ছি' বলে ভজহরি আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে বিছানায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে।

পল্টনের মা তখন হাতে ভর দিয়ে চৌকাঠ পেরোতে চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না।

চৌকাঠ পেরোতে গিয়ে আবার মুখ থুবড়ে পড়লো পল্টনের মা। ভজহরি তাড়াতাড়ি উঠে এলো। বৌকে তুলে ধরে বসালো।

কত দিন পর আজ আবার স্বামীর হাতের স্পর্শ পেয়েছে পল্টনের মা। শুধু এই আনন্দেই তার দু'চোখ জলে ভরে উঠলো।

সোনা তখন-পল্টনকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে বলছে, ছিঃ ছিঃ, শেষটা তোকে খেঁকিতে কামড়ালো। কি রকম মদ্দা মানুষ তুই!

সকাল থেকে আজ গুমটি মাঠ কেমন যেন থমথম করছে।

তবু তার মধ্যে জীবনের স্বাদ। পিরু দাস আর সতী বাচ্চা দুটিকে বৈরাগীর ঘরে রেখে সিনেমা দেখতে যাচ্ছে।

কত বদলে গেছে পিরু। নেশা-ভাঙ ছেড়ে দিয়েছে। কাজ করছে মন দিয়ে। সংসারের ওপর নজরটাও পুরোপুরি। সতীও এখন সুস্থ। তার অঙ্গে অঙ্গে আবাব যৌবনের ঢল নেমেছে।

পিরু আর সতী সিনেমা দেখতে যাচ্ছে—এটাও গুমটি মাঠের টাটকা খবর। পল্টনকে খেঁকি কুকুরে কামড়েছে, খবরটা এখন বাসি হয়ে গেছে।

লীলা আজ আর ঘরের বাইরে যায়নি। শুধু একবার পুকুরঘাটে গিয়েছিল এই পর্যন্ত। অন্যদিন সোনামাসি বার বার আসে লীলার কাছে, আবার লীলাও যায় সোনার ঘরে—কিন্তু আজ তাদেব আসা-যাওয়া বন্ধ।

রেশমী সকাল থেকে এক বুক কান্না আর ভাবনা নিয়ে বসে আছে। কান্না তার শ্যামলী নামে টিয়াপাখিটার জন্যে। আর ভাবনা তার নিজের কথা নিয়ে।

সন্ধ্যের আগে বিশাখা এলো রেশমীকে ডাকতে। বললে, রেশমী দিদি, একবার আসবে, বাবা ডাকছে।

—চল, যাচ্চি।

—না। লীলা বাধা দিলে, কোথাও যাবি না খুকি।

—আমি যাবো। বসেছিল রেশমী, উঠে দাঁড়ালো।

লীলা বললে, যাবি তো আর ঘরে ঢুকবি না।

রেশমী মায়ের মুখের দিকে তাকালো। বেশ খানিক সময় দাঁড়িয়ে রইলো মায়ের মুখের দিকে চেয়ে। তারপর বললে, আমি জানি—তুমি যা কিছু করছো, সবই চাপে পড়ে। কিন্তু মা—তুমি তো আমাকে জানো।

লীলা চাপা উত্তেজনায় অস্থির হয়ে পড়ে। রেশমী এগিয়ে আসে। মায়ের মুখোমুখি নিবিড় হয়ে দাঁড়ায়। বলে, সত্যি বলো তো মা—তুমি কি মনের সায় নিয়ে আমাকে এই জানোয়ার পল্টনের হাতে তুলে দিতে চাও?

লীলা নিরুত্তর।

রেশমী বলে, আমি জানি মা—তোমার মনের খবর আমি জানি।

লীলার দু'চোখ জলে ভরে ওঠে।

রেশমী দাঁড়ায় না, চলে যায় বৈরাগী কাকার ঘরে।

সন্ধ্যার গুমটি মাঠ মুখর হলো মিলিত কণ্ঠের গানের সুরে। রেশমী আবার ফিরে এসেছে আপন সত্তার বিন্দুতে।

।। নয় ।।

ছোটলাল হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে চলে এসেছে।

ওর মা বলেছিল, আর গুমটি মাঠ নয়, চল তোর মামার বাড়ির গাঁয়ে চলে যাই। এখানেও আছি খুপরি ঘর ভাড়া করে, সেখানেও মাথা গোঁজার মতো জায়গা ঠিকই পাওয়া যাবে।

কিন্তু ছোটলালের এক কথা, গুমটি মাঠ ছেড়ে সে কোথাও যাবে না।

হাসপাতাল থেকে ফিরেছে যদিও, এখনো ছোটলালের শরীর ঠিক হয়নি। ডাক্তারবাবুরা বলেও দিয়েছেন, আরো দিন পনেরো শরীরকে বিশ্রাম দিতে হবে। আর ওষুধ যেমন চলছে তেমনি চলবে।

যেদিন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল, সেদিন বিকালেই হারানো রিকশা ফিরে পেল ছোটলাল।

স্টেশন পাড়ার বড় পুকুরে টানা জালে মাছ ধরার সময় জাল আটকে যায় জলে ডোবা রিকশায়। মনোহর রিকশাওয়ালা এই পাড়াতেই থাকে, সে-ই রিকশাটা টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এলো গুমটি মাঠে।

রিকশাটা পেয়ে ছোটলাল কিছুটা স্বস্তি পেল। ব্যাঙ্কের টাকায় কেনা ওই রিকশাটাই ওকে, ওর মাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

কিন্তু ফিরে পাওয়া রিকশার যা দুর্দশা, তাতে এখনি এক-দেড়শ টাকা খরচ না করলে হবে না। এখন ভাবনা, এত টাকা কোথায় পাবে।

রেশমী বললে, ও টাকা আমি দেবো। অনেক টাকা না থাকলেও এক-দেড়শ টাকা আমি দিতে পারবো।

ছোটলালের ঘর থেকে এসে রেশমী দেখলো দেবু অপেক্ষা করছে নিম্বেশ্বরতলায়। সাইকেলটা পাশেই দাঁড় করানো।

গত দুদিন দেবু আসেনি। দুদিন বাদে রেশমীকে দেখলো দেবু। রেশমী যেন অনেক বদলে গেছে। কেমন বিবর্ণ হয়ে গেছে তার মুখ-চোখের চেহারা।

—আজ কি বার মনে আছে?

—কেন, বুধবার।

—মনে ছিল না, আজ তোমার বেলা দশটায় টাউন বাজার যাওয়ার কথা ছিল?

—এই রে একদম ভুলে গেছি।

সিদ্ধেশ্বরতলার বাঁধানো বেদীতে কথা বলতে বসলো ওরা। প্রথমেই একটা জবর খবর দিলে দেবু। বৌ-এর হাতে বেধড়ক ঠ্যাঙানি খেয়েছে রজব আলী। অপমান হজম করা ছাড়া উপায়ও নেই রজবের। ওর শ্বশুর আক্কাছ মিয়ার যা দাপট, তাতে রজবের মতো জামাই-এর টুঁটি চেপে ধরাটা তার কাছে মাছি-মশা মারার ব্যাপার।

রজবকে নিয়ে তার বৌ মেদিনীপুর চলে গেছে।

এ-সব কথা শোনার পরেও রেশমী কোনো কথা বললে না। বরং তাকে অন্যমনস্ক মনে হলো। হয়তো সব কথা সে শোনেনি। দেবু কিছুটা বিস্মিত। রেশমীর সে উত্তাপ কোথায় গেল!

—কি ভাবছো দেবুদা?

—কিছু না।

—তুমি ভাবছিলে আমার কথা। আমি জানি দেবুদা, আমাকে আজ তোমার অন্যরকম লাগছে। কিন্তু আমি যা ছিলাম, তাই আছি।

দেবু তাকালো রেশমীর মুখের দিকে।

কথার মধ্যে লীলা দু পেয়ালা চা দিয়ে গেল। দেবু ব-লে, আমার কিন্তু খুব ক্ষিধে পেয়েছে মাসিমা।

—মুড়ি আছে, খাবে?

—আমাদের কাছে মুড়িই মোয়া মাসিমা।

রেশমী লক্ষ্য করলো মা আজ হঠাৎ কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। রেশমী জানে এবং বোঝে মায়ের মনের দিকটা।

মুড়ি-চা খেয়ে দেবু উঠে পড়লো। সাইকেলে একটা পাক খেয়ে আবার ফিরে এলো। রেশমী তখন ঘরে।

রেশমীর নাম ধরে ডাকলো দেবু। বেরিয়ে এলো রেশমী। বললে, কি ব্যাপার?

—শোনো একটা কথা জানিয়ে যাই, পল্টন কিন্তু আড়তদারদের দালালি করছে। বিশ্বাস কোম্পানীতে এখন ওর আড্ডা। আর ওদের

যত রাগ তোমার ওপর।

—রাগ নয়, অনুরাগ। রেশমী হাসলো। বললে, নাচতে যখন নেমেছি নাচার মতন নাচবো। ঘোমটা দিতে চাই না।

দেবু আর অপেক্ষা করলো না, সাইকেল ছুটিয়ে চলে গেল। বলে গেল, বিকালে যেন রেশমী একবার তার কাছে যায়।

রেশমীর চোখ পড়লো গুমটি মাঠের দক্ষিণ দিকে। বুড়ো ফণিমনসার গাছের পাশে দাঁড়িয়ে পল্টনের চেলা জগু সিগারেট টানছে তারই দিকে চেয়ে।

চোখ ফিরিয়ে নিলে রেশমী। জগুটাকে দেখলে ওর গা ঘিনঘিন করে।

লীলা বঁটিতে আঙুল কেটেছে। ধারালো বঁটি। আঙুলের মাথায় বেশ খানিকটা বসে গেছে। হাতটা ভাঁজ করে উঁচু করা। আঙুলের রক্ত কনুই দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। লীলা দেখছে।

রেশমী ঘরে ঢুকে অবাক। এত রক্ত ঝরছে, তবু মায়ের মুখে এতটুকু যন্ত্রণার ছাপ নেই। রেশমী ডাকলো, মা।

লীলা ফিরে তাকালো বললে, কিরে?

—তুমি কী মা! দেখতে পাচ্ছো না। বলেই খানিকটা ন্যাকড়ার ফালি নিয়ে কাটা আঙুল বাঁধতে বসলো রেশমী।

—মাকে তুই এখনো ভালোবাসিস? লীলার শুকনো চোখ দুটি ভিজে ওঠে। রেশমীর চোখ মায়ের চোখে। মায়ের চোখ দুটি আগে কত উজ্জ্বল ছিল। সে চোখ আর নেই। তারপর মুখের ওপর রেখাগুলো বড্ড বেশি কুঁচকে গেছে।

—মা।

লীলার চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে পড়ে। একবার চাপা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললে, চল খুকি—আমরা আজ রাতের অন্ধকারে অন্য কোথাও চলে যাই।

রেশমী দু-চোখে বিস্ময় নিয়ে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে আছে।

লীলা একটু চুপ করে থাকে। তারপর নিচু গলায় বলে, নয়তো ওরা আমাদের বাঁচতে দেবে না।

—ওরা কারা মা ?

—শ্যামলী নামে পাখিটাকে যারা বাঁচতে দেয়নি।

রেশমীর দুটি চোখে হঠাৎ যেন আগুনের ছোঁয়া লেগে জ্বলে উঠলো। মেয়ের এ চাউনির মানে লীলা ভালো করে জানে। ভয় পায় লীলা। বলে, তুই আর না করিস নে খুকি। চল, আজই আমরা শেষ ট্রেনে চলে যাই।

—কোথায় যাবে মা ? পালিয়ে তো বাঁচা যায় না। তাছাড়া কিসের ভয় ?

—ভয় পেয়েই বাবলু চলে গেল।

—কি বলছো মা !

--যা বলছি শোন, লীলা মাটিতে চোখ রেখে বলে, পল্টন তাকে শাসিয়েছিল, সে যদি তোর দিকে হাত বাড়ায় তাহলে তার ধড় থেকে মুণ্ডুটা আলাদা করে দেবে।

—বাবলু ভীরু তাই চলে গেছে। রেশমী বলে, জানোয়ারের ভয়ে মানুষ পালিয়ে যাবে কেন ?

অতশত আমি বুঝিনে খুকি। লীলা বলে, এখানে আমরা বাঁচতে পারবো না।

—মা। রেশমী বলে, এখানেই আমরা বাঁচবো।

কথার মধ্যে সোনামাসির সাড়া পেয়ে মা-মেয়ে চুপ করে যায়। হেলতে দুলতে সোনামাসি দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে।

—এসো সোনাদিদি।

সোনামাসি ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে রেশমী বেরিয়ে যাবে বলে দরজার দিকে যায়। সোনামাসির চোখটাও রেশমীর পিছু যায়।

রেশমীকেই শুনিয়ে বলে, হ্যাঁরে রেশমী, সবাই তো বলে তুই নাকি টাউন বাজারের এক নম্বর মেয়ে।

রেশমী ফিরে দাঁড়ায়। কটমটিয়ে তাকায় সোনামাসির দিকে। সোনামাসি গলায় গিটকিরি দিয়ে বলে, তা শোন রেশমী—আমার পল্টনও কিন্তু এক নম্বর। দুজনে মিলবে ভালো। রাজযোটক।

গা-ঝটকা দিয়ে বেরিয়ে যায় রেশমী।

সোনামাসি জাবড়ে বসলো মেঝের ওপর। লীলা বললে, ও কি দিদি—মেঝের ওপর বসলে কেন, দাঁড়াও আসন পেতে দেই।

—না, আর আসনফাসন চাইনে। সোনামাসির মুখে পানজর্দার ট্যাবলা। জাবর কাটতে কাটতে বলে, একটা কথা বলতে এলাম। ভরসা দাও তো বলি।

—বলো কি বলবে।

—রেশমীরে আটকাও। নয়তো ও মেয়ে ঘরছুট হয়ে যাবে।

কথাটা সূঁচের মতো বিঁধলো লীলার কানে। কোনোদিন সে এই ডাকসাইটে সোনামাসির মুখের ওপর কথা বলে না। আজ কি হলো, হঠাৎই বলে ফেললো, যদি যায় যাবে। তুমি যেমন পল্টনকে আটকাতে পারলে না, আমিও তেমনি।

—আমার পল্টনের সঙ্গে রেশমীর তুলনা! সোনামাসির মুখের চেহারা বদলে গেছে। উঠে দাঁড়ালো। বললে, আমি হলে অমন ধিঙ্গি মেয়ের গলা টিপে মারতাম।

—তুমি ওই মেয়েকে ঘরের বৌ করতে চাইছো কেন তবে?

সোনামাসি বেকায়দায় পড়ার মেয়েমানুষ নয়। বলে, কথায় বলে যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল। পল্টনের মতো ডানপিটে ছেলের বৌ হবে ভ্যাদামারা মেয়ে, তা তো হয় না। ওর জন্যে রেশমীর মতো মেয়েই দরকার। তাছাড়া এটা তুমি তো জানো, রেশমী হলো পল্টনের মন-পছন্দ মেয়ে।

লীলা আচমকা বলে বসলো, পল্টনের সঙ্গে আমার খুকির বিয়ে দেবো না সোনাদিদি।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সোনামাসি একবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে লীলার দিকে তাকালো। তারপর থপথপে শরীরটা নিয়ে হেলতে দুলতে চলে গেল। যাবার সময় বারান্দা থেকে কথা ছুঁড়ে দিয়ে গেল, এ্যাতো গরম—তবু যদি মেয়ের জন্মের ঠিক থাকতো।

সোনামাসি চলে যেতে রেশমী আবার ঘরে এলো। এইটুকু সময়ের জন্য সে রান্নাঘরেই ছিল। সোনামাসির শেষ কথা তার কানে গেছে।

রেশমীর চোখ পড়লো মায়ের হাতের আঙুলের দিকে। রক্তে ভিজে গেছে বাঁধা ন্যাকড়া।

লীলা স্থির দাঁড়িয়ে। যেন পাথরের মূর্তি। কিন্তু মূর্তির চোখে আজ এতটুকু জল নেই।

ও কি মা, এখনো তো রক্ত বন্ধ হয়নি। চলো ডাক্তারের কাছে যাই।

মায়ের ওজর-আপত্তি কানে নিলে না রেশমী। মাকে নিয়ে চললো হাসপাতালে।

পথেই একটা রিকশা পেয়ে গেল।

রিকশায় উঠেই মা আঁকড়ে ধরে মেয়ের হাত। রেশমী ফিরে তাকায় মায়েব মুখের দিকে। কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে উঠেছে মায়ের মুখ।

—কি হলো মা?

লীলার চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ।

রেশমী এদিক-ওদিক দেখলো। হঠাৎ তার চোখ পড়লো একজন হোঁতকা চেহারার ছোকরা বসে বিশ্রী ভঙ্গিতে দেখছে তাদের।

চলতি রিকশায় লীলা বলে, ছেলেটাকে কি বিশ্রী দেখতে। মুখটা নেকড়ের মুখের মতো।

—ছাড়ো তো মা। রেশমী ব্যাপারটা উড়িয়ে দিলে, কে না কে। পথেঘাটে ওই রকম কত লোকই দেখা যায়।

—কিন্তু ছেলেটা কি বিশ্রীভাবে দেখছিল।

—দেখলোই বা। রেশমী হেসে বললে, রাস্তায় বেরোলে কত লোকই ওই রকম দ্যাখে।

লীলা আর কথা বাড়ালো না। কিন্তু এক একবার পেছন ফিরে দেখছে নেকড়েমুখো সেই ছেলেটা আসছে কিনা।

রিকশা হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে কাছারি পাড়ার দিকে যাচ্ছে। পশ্চিম আকাশের কোণে টুকরো মেঘ। বাতাসে মেঘের হাত-পা ছড়িয়ে পড়েছে।

কাছারি পাড়ার মোড় পেরিয়ে ধাঙড় পাড়া। ধাঙড় পাড়া পেরিয়ে মাথা-ভাঙা বটগাছটা। বটগাছের পাশে একটা ঝুপড়ি মতো ঘর।

পল্টন আর তার চেলারা তাস পিটছে ঝুপড়ির মধ্যে। সেই নেকড়েমুখো ছেলেটাও রয়েছে।

রিকশায় রেশমীকে দেখে ওরই মধ্যে একটি ছোকরা সিটি মারলো। সঙ্গে সঙ্গে একজন বলে উঠলো, শালা—কি মাল মাইরি।

রেশমী এসব কথা হজম করার মেয়ে নয়। শুধু মা আছে বলেই চুপ করে গেল। গুমটি মাঠে পৌঁছে লীলা শুধু একটি কথাই বললে, তুই একা-একা বেরোসনে খুকি।

দুপুরে বাবলুর চিঠি এলো। চিঠিটা হাতে নিয়ে রেশমী একবার ঘরের দিকে তাকালো। মা ঘুমোচ্ছে।

চিঠিটা খুললো রেশমী। ছোট্ট চিঠি। লিখেছে, যত তাড়াতাড়ি পারে রেশমী যেন তার মাকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যায়। নয়তো পল্টনের হাত থেকে রেশমীর মুক্তি নেই। বাবলু আরো জানিয়েছে, পল্টন শুধু তাকেই ছোরা দেখায়নি, তার মাকেও শাসিয়ে ছিল।

একথা-ওকথার পর বাবলু পুরানো কথাটাই জানিয়েছে. রেশমীর ওপরে তার ভালোবাসা মিথ্যে ছিল না. সে এখনো ভালোবাসে রেশমীকে। আর এ ভালোবাসাটা সে চিরদিন মনের মধ্যে পুষে রাখবে ।ঃ

চিঠিটা বার তিনেক পড়লো রেশমী। একসঙ্গে একরাশ সুখ আর দুঃখ ওকে মথিত করলো। কিন্তু সুখের পাখি অনেক দূর, দুঃখটাই এখন সত্যি—চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে তবে স্বস্তি পেল রেশমী।

বাবলুর চিঠিটা আজ ওর মনটাকে তোলপাড় করে দিয়েছে। বিকালে দেবুর সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল—সে কথাটা ভুলেই গেছে।

সন্ধ্যের পর দেবু এলো।

দেবুকে দেখেই রেশমীর মনো হলো, বিকালে তার কাছে যাওয়ার কথা ছিল রেশমীর। দেবুকে দেখেই ভুলের কথাটা আগে-ভাগে স্বীকার করে নিলে রেশমী।

দেবু বললে, তোমার কাছে এটা আশা করিনি রেশমী।

রেশমী বললে, আমাকে ক্ষমা করে নিয়ো দেবুদা

দেবু বললে, যাক ওসব কথা, এখন তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। কৌশল্যাদির বাড়িতে সব বসে আছে।

রেশমী বললে. আমার আর তৈরি হবার কি আছে। চলো। তোমার সাইকেলে তো আলো নেই, পারবে তো অন্ধকারে আমাকে নিয়ে চলতে ?

দেবু বললে, দু মিনিটের পথ গেলেই তো আলো পাবো। এসো—

শাড়ি গোছগাছ করে সাইকেলের সামনে বসলো রেশমী। দেবু গুমটি মাঠের চৌহদ্দি পেরিয়ে দ্রুত সাইকেল ছুটিয়ে দিলে।

রেশমীর রেশম-রেশম চুল উড়ে এসে পড়ছে দেবুর চোখে-মুখে।

শাড়িটা যদিও চেপে জড়ানো, আঁচলের একটা কোণ সায়ার দড়ির সঙ্গে গোঁজা, কিন্তু আধখানা আঁচল পত পত করে উঠছে।

—রেশমী। দেবু শুধু একবার রেশমীর নাম ধরে ডাকলো

—কিছু বলবে?

—যদি সারাজীবন এমনি করে একসঙ্গে ছুটে চলতে পারতাম।

—জীবনটা স্বপ্ন নয় দেবুদা।

দেবু চুপ করে গেল তখনকার মতো।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। তারপর রেশমীই বললে, আমি জীবনটাকে একসময় স্বপ্ন দিয়ে ঘিরে রাখতে চেয়েছিলাম। জানো দেবুদা—এখন ভাবি জীবনে স্বপ্নের জায়গা নেই।

দেবু কোনো কথা বললে না।

কৌশল্যার বাড়ির কাছাকাছি এসে রেশমী বললে, আমাকে সাইকেল চড়াটা শিখিয়ে দেবে দেবুদা?

—শিখিয়ে দেবো, না শিখবে? দেবু সাইকেল দাঁড় করালো। সামনেই কৌশল্যার বাড়ি।

নামতে পারছে না রেশমী। পা দুটো চিন্‌চিন্ করছে। বিশেষ করে বাঁ পা-টা। নাড়তেই পারছে না।

—কি হলো, নামো?

—নামতে যে পারছি না দেবুদা। হাতটা ধরো না।

সাইকেলটাকে নিজের গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে রেশমীকে দু-হাত ধরে নামাতে গেল দেবু। পায়ে এমন ঝিঁঝি লেগেছে, দাঁড়াতে পারলো না রেশমী। পায়ে জোর না পেয়ে দুহাতে ধরলো দেবুকে। মুখটা তার নুয়ে পড়েছে দেবুর বলিষ্ঠ বুকে।

দেবু তখনো দুহাতে ধরে আছে রেশমীকে। রেশমী একটা পায়ে ভর দিতে চেষ্টা করে আর একটা মাটি থেকে ওপরে তুলে নাড়ছে।

হেসে ফেললো রেশমী। লজ্জা জড়ানো চোখে তাকালো দেবুর

মুখের দিকে।

দেবু নিচু গলায় বললে, আমরা কিন্তু স্বপ্ন দেখছি না রেশমী।

রেশমী মাথাটা নিচু করলো। তার দেহে মনে এক বিচিত্র অনুরণন।

॥ দশ ॥

রাত তখন দশটা।

স্টেশন পাড়া অব্দি দেবু আর রেশমী পায়ে হেঁটে এলো সারাটা পথ ওরা প্রায় নীরবেই এসেছে।

স্টেশন পাড়া পেরিয়ে রেশমী দেখলো রিকশা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাঁচকড়ি। সহেলীর ভাই। মাছের আড়তে কাজ করে সহেলী।

—বাড়ি যাবে তো দিদি? এসো—আমিও এবার যাবো।

ভালোই হলো পাঁচকড়িকে পেয়ে। এবারে এটুকু পথ সে রিকশাতেই চলে যাবে। দেবুকে বললে, তুমি যাও দেবুদা।

দেবু বললে, আমি না হয় দিয়েই আসি বাড়ি অব্দি।

রেশমী বললে, মিছে আর কেন যাবে। বাড়ি তো পাঁচ মিনিটের পথ।

দেবু বললে, ঠিক আছে—তবে যাও। শোনো, কাল সকালে আমি আসছি তোমার কাছে। একটু দেরি হবে।

রিকশায় চেপে বসলো রেশমী। বললে, তোমার রিকশায় আলো নেই পাঁচকড়িদা?

আমাদের চোখ জ্বলে দিদি। পাঁচকড়ি বললে, আলোটা আজ দুপুরে কে খুলে নিয়ে গেছে। দু-টাকার টিমটিমে আলো. তারও ওপর চোরের হাত। দিদি, কি আর বলবো, এই রকম হালচাল এখন।

পাঁচকড়ির সঙ্গে কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল রেশমী। সংসারের সুখদুঃখের কথা বলছিল পাঁচকড়ি।

ধাওড় পাড়ার পাশ দিয়ে রাস্তাটা গেছে গুমটি মাঠের দিকে। এদিকটা অন্ধকার। মাঝে একটা কালভার্ট আছে। ওখানে রাস্তাটাও গাড্ডায় ভর্তি।

কালভার্টের ওপর থেকে চোখে ধাঁধানো টর্চের আলো পড়লো রেশমীর মুখে। পাঁচকড়ি গায়ের জোরে রিকশা ছোটাতে চেষ্টা করলো। ঠিক সেই মুহূর্তে চার-পাঁচজন লোক ঝাঁপিয়ে পড়লো রিকশার ওপরে।

রেশমী তারস্বরে চিৎকার করতে চাইলো। কিন্তু পারলো না। তার মুখ চেপে ধরেছে বলিষ্ঠ দুটি হাত। অন্ধকারের মধ্যে রেশমী দেখতে পেল লোকটির হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। এ পল্টন ছাড়া আর কেউ নয়।

রেশমী দু হাত দিয়ে খাচচে ধরলো পল্টনের মাথার চুল। পাঁচকড়িও রুখতে চেষ্টা করলো, কিন্তু তাকে দুজন মিলে ধাক্কা দিয়ে পাশের খানায় ফেলে দিলে।

চার-পাঁচ জন মিলে রেশমীকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে চললো মুন্সীর বাগানের দিকে। যে দিকে লোকজনের বাস নেই। শুধু বাগান আর মাঠ।

পাঁচকড়ি উঠে এলো। গা-হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপছে। কোন-মতে রিকশা নিয়ে এলো গুমটি মাঠে।

ঘরে তালাবন্ধ করে হারু বৈরাগীর ঘরে বসে কথা বলছিল লীলা। পাঁচকড়ি মাঠকোঠার নিম্বেশ্বরতলায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ডাকতে লাগলো, ও মাসি, মাসি—ও রেশমী দিদির মা।

চিৎকার শুনে শুধু লীলা নয়, হারু বৈরাগী, বটুক হালদার ও আরো অনেকে এলো। এমন কি সোনামাসিও।

খবরটুকু জানিয়েই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো পাঁচকড়ি।—কি হবে আমার রেশমী দিদির?

খবর শোনার পরেও লীলা একেবারে চুপচাপ। সে শুধু একবার

হারু বৈরাগীর মুখের দিকে চেয়ে বললো, দ্যাখো তোমরা কি করবে বৈরাগী ঠাকুরপো।

ছোটলাল এখনো ভালো করে হাঁটতে পারে না, সে-ও ছুটে এলো। তার হাতে ধারালো একটা ছুরি। সে দাঁতে দাঁত ঘষে চিৎকার করে বললে, আমি জানি কাবা রেশমী দিদির সর্বনাশ করতে চায়—যদি সেই পালের গোদার মুণ্ডুটা এক কোপে নামাতে না পারি, আমার নাম ছোটলাল নয়।

সোনামাসি এসেছিল যদিও, এখন পালাতে পারলে বাঁচে। বটুক হালদার ঠোঁটকাটা মানুষ, সোনামাসি সটকে পড়ছে দেখে বলে উঠলো, কিগো পল্টনের মাসি—তোমাকেও যেতে হবে আমাদের সঙ্গে।

হারু বৈরাগী এত সময় চুপ করে ছিল। সে-ও উত্তেজনায় ফেটে পড়লো। চিৎকার করে বললে, দেখি কোন হারামজাদা বেজন্মারা রেশমী মায়ের ইজ্জৎ নিতে চেয়েছে। চলো সব।

গুমটি মাঠের সব মানুষ ততক্ষণে এক জায়গায় জড়ো হয়েছে। বটুক হালদার চিৎকার করে বলে ওঠে, চলো সব।

সবাই দল বেঁধে চললো ধাঙড় পাড়ার কালভার্টের দিকে। শুধু গুমটি মাঠ নয়, আশেপাশের কিছু ছেলেছোকরাও বেরিয়ে এসেছে।

এত সময় আকাশ ছিল মেঘে ঢাকা। গুমোট ছিল আবহাওয়া। আচমকা ঝড় উঠলো। ঝড়ের সঙ্গে নামলো বৃষ্টি।

সেই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে গুমটি মাঠের মানুষেরা পাগলের মতো এদিক-ওদিক তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগলো রেশমীকে।

মুন্সী বাগানের মধ্যে পোড়ো ঘর। একসময় মুন্সীদের বাগান-বাড়ি ছিল। এখন শুধু বাড়ির কংকালটাই আছে। ঘরটা এখন ওয়াগন ব্রেকার, আর মস্তানদের আড্ডা।

এই পোড়ো ঘরেই পাওয়া গেল নগ্ন-বিধ্বস্ত রেশমীকে। রেশমীর

তখন চেতনা নেই।

জড়ো হওয়া মানুষেরা এক বুক ঘৃণা নিয়ে দেখলো এই দৃশ্য। হারু বৈরাগী তো রেশমীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। বটুক হালদার ঘরের কোণ থেকে একটা রুমাল কুড়িয়ে পেল। রুমালের কোণে লেখা পল্টনের নাম।

বটুকের চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। রুমালটা দেখালো সবাইকে। জড়ো হওয়া মানুষেরা তখন উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে।

কিন্তু উত্তেজনা প্রকাশের সময় এখন নয়। অচেতন রেশমী বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে আছে চোখের সামনে। এখন প্রথম কাজ রেশমীকে নিয়ে হাসপাতালে যাওয়া।

সেই জল-ঝড়ের মধ্যে গুমটি মাঠের মানুষেরা রেশমীকে নিয়ে এলো হাসপাতালে।

খবর যেন হাওয়ায় ওড়ে। রাত ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে আড়তের মেয়েরা অনেকেই এলো। এলো বরফকলের কর্মীরাও। এ-ছাড়া রেশমীর পড়শিরা তো আছেই।

রেশমীকে হাসপাতালে পৌঁছে বটুক হালদার গেছে দেবুর কাছে। রাত থাকতেই গেছে, অথচ দেখা নেই দেবুর।

যারা এসেছে, হাসপাতাল প্রাঙ্গণে অপেক্ষা করছে গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে। এখনো রেশমীর চেতনা ফেরেনি। এখনো বিপদ কাটেনি।

একটু বেলা হতে বাইরে খবর এলো রেশমী চোখ মেলে চেয়েছে। এই খবরটুকুই যেন আশার আলো।

বৈরাগী বৌ এসে পৌঁছলো লীলাকে নিয়ে। লীলা এখন শান্ত স্থির। চোখে জল দূরে থাক, মুখে-চোখে কান্নার রঙ অব্দি নেই। জানতেও চাইলো না রেশমী কেমন আছে।

ভিতর থেকে একজন নার্স বাইরে এলো। ছোট্ট খবর—রেশমী

মা বলে ডেকেছে।

এবারে লীলা আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলো না। বৈরাগী বৌকে জড়িয়ে ধরে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লো।

বৈরাগী বৌ-এর দুচোখ জলে ভরে গেল।

আরও কিছুক্ষণ বাদে একজন বৃদ্ধ ডাক্তার বেরিয়ে এলেন। জানতে চাইলেন, মেয়েটির মা কি এখানে আছেন?

লীলা জলভরা দুটি চোখ তুলে তাকালো ডাক্তারের মুখের দিকে। বৃদ্ধ ডাক্তার কাছে ডাকলেন লীলাকে। বললেন, আপনি মেয়েটির মা? একবার আসুন আমাব সঙ্গে। কিন্তু একা। আর একটি কথা যদি মেয়ের ভালো চান, ভিতরে গিয়ে কান্নাকাটি করবেন না।

লীলা আঁচলে চোখের জল মুছলো। মনটাকে শক্ত করলো। মনে করলো, রেশমীর মা সে।

ডাক্তারকে অনুসরণ করে লীলা এলো মেয়ের কাছে।

শুয়ে আছে রেশমী! আশপাশে ডাক্তার, নার্স।

লীলা এসে দাঁড়ালো রেশমীর শয্যাপ্রান্তে।

একবার মায়ের মুখের দিকে তাকালো রেশমী। অস্ফুট কণ্ঠে মা বলে ডাকলো। তারপর আবার দুচোখ বন্ধ করলো।

হঠাৎ রেশমীর শরীরে কাঁপুনি এলো। আবার চেতনা হারালো রেশমী।

লীলাকে বাইরে নিয়ে এলো নার্স বললে, আপনি বাইরে অপেক্ষা করুন।

লীলা বললে, আমার মেয়ে বাঁচবে তো দিদি?

নার্স অনুচ্চ কণ্ঠে বললে, যে মেয়ে এত মানুষের ভালোবাসা পেয়েছে, সে মেয়ে বাঁচবে বৈকি। যান, আপনি বাইরে গিয়ে বসুন। আপনি মা, আপনার মনের অবস্থা আমরা বুঝি।

লীলা বেরিয়ে এলো। তার দুচোখ আবার জলে ভরে উঠেছে। সে জল বিন্দু হয়ে ঝরে পড়ছে মাটিতে।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা টাউন বাজার চঞ্চল হলো একটি খবরে। রেশমী ধর্ষিতা।

আরো খবর ছড়িয়ে পড়লো, পল্টনের দুই চামচা ঝান্টু আর জগাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে মালতীপুর স্টেশনে। নেকড়েমুখো একটি হোঁতকা চেহারার লোক চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে জখম হয়েছে। পল্টনের কোনো পাত্তা নেই। ওদিকে গুমটি মাঠের খবর, সোনামাসিকে নিয়ে ভজহরি চলে যাচ্ছিল, গুমটি মাঠের ছেলেরা তাদের দুজনকে আটকে রেখেছে।

গোটা টাউন বাজার আজ থমথম করছে। রেশমীর নাম আজ মুখে মুখে।

এরই মধ্যে সুখবর, রেশমী স্বাভাবিক চেতনা ফিরে পেয়েছে।

দেবু আর বটুক হালদার এলো এই সুখবরের মুখেই।

প্রথমে লীলার কাছে গেল দেবু। বললে, মাসিমা, আপনি এখানে কেন? বাড়ি যান।

লীলা জড়িয়ে ধরলো দেবুর দুটি হাত। বললে, আমার রেশমীর কি হবে?

এই মুহূর্তেও দেবুর মুখে হাসি। বললে, আপনার মেয়ে বাঁচতে জানে মাসিমা।

—কিন্তু কি হবে ওর?

—মাসিমা, এখন কোনো কথা নয়—আপনি বাড়ি যান।

শুধু লীলাকেই নয়, যারা অপেক্ষা করছিল, তাদের সবাইকে একই কথা বললে দেবু।

কথাটা ঠিকই বলেছে দেবু। এখনো কয়েকদিন হাসপাতালে থাকতে হবে রেশমীকে, সে কদিন তো হাসপাতাল প্রাঙ্গণে বসে থাকা সম্ভব নয়।

তবু আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো সবাই। বিকালের দিকে

যে-যার চলে গেল। শুধু দেবু আর বটুক হালদার রইলো।

সন্ধ্যার মুখে শোনা গেল ন্যাজাট লঞ্চঘাট থেকে পল্টনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বাইরের এত খবর, রেশমী তার কোনো খবরই রাখে না। তার অবসন্ন চেতনায় এখন একই চিন্তা, এর পর সে কোথায় যাবে। তাকে নিয়ে যেতে কে অপেক্ষা করবে হাসপাতালের বাইরে?

পাঁচ দিন পর।

হাসপাতাল থেকে রেশমীর আজ ছুটি হয়ে যাচ্ছে। মা এসেছে তাকে নিতে।

আস্তে আস্তে হাসপাতালের বাইরে এলো রেশমী। দেখলো বাইরের পৃথিবীটা ঠিক একই রকম আছে।

চোখ পড়লো প্রাঙ্গণের কৃষ্ণচূড়া গাছটার দিকে। গাছে এখন ফুল নেই। সবুজ পাতা।

রেশমী দুচোখে বিস্ময় নিয়ে দেখলো, কৃষ্ণচূড়ার ছায়ার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসছে দেবু। সে স্বপ্নে বিশ্বাস করে না।

তবু এই মুহূর্তটা স্বপ্নের মতো মনে হয় রেশমীর।